০ ॰ ॰ ১ ২´ ৩
। া া ন না। র্সা না ধধা I পা ধা র্রা । র্রা -া -া }।
॰ ॰ নই ক গো তার্ অ ভি লা ষী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া র্সর্সা। র্সা র্সা ধা I না না না । পা -া -া ।
॰ ॰ আম্ রা শু ধু ভা ল বা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। ধা ধা ধা । গা -া -া I রা গা রা । (সা -া -া) }।
ভা ল বা সি ॰ ॰ ভা ল বা সি ॰ ॰

২´
। র্সা -া -া II II
সি ॰ ॰

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২৮]

স্বাধীনতার স্বরূপ।

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

স্বাধীনতার অর্থ কি ? এক কথায় ইহার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব ; তবে আমরা এইরূপে ইহার বর্ণনা করিতে পারি যে ইহা সেই অবস্থা ও সেই সর্ত্ত যাহা কোন জাতিকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে এবং স্বীয় ভাগ্য গঠন করিতে সমর্থ করে। কিরূপে বিভিন্নজাতি জাতীয় স্বভাবধর্ম্ম ও জাতিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ও নির্ম্মল রাখিবার জন্য স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি পত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা ফিন্‌ল্যাণ্ড পোল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতেও ইহার নিদর্শন পাই। ইহাদের প্রত্যেকেই বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার বহিরারোপের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এই সকল জাতির ইতিহাস একই ধারায় বহিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা বৈদেশিক শিক্ষার নিকট স্বীয় সভ্যতার পরাজয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে বৈদেশিক শক্তি হইতে কোনরূপ বাধা না পাইয়া আত্মভাগ্য বিধানের অধিকার পাইবার জন্য তাহারা স্বাতন্ত্র্য সত্তা স্বীকার করাইবার দাবি করিয়াছে।

আমাদের চরম লক্ষ্যই স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাইনা ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এইখানে আমি ভারতের কবি

রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমায় বাধা দিয়া বলিতেছে "পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার সম্মেলনেই জগতের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।"

আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে, যেমনটি এতাবৎকাল হইয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষা দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অসম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে। যখন ভারতে জাতীয় জীবনের অন্তর স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।

[আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ]

কবির প্রতি

(দরবেশ)

জাগো কবি! জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হতে
হের এ ধূলার ছবি।
দীর্ঘ তমস আধার অন্তে,
উষা হাসিয়াছে পূরব প্রান্তে,
পশ্চাতে তার কিরণ-কান্ত
ওই ধ্বান্তারি রবি।

মমুখ-মেখলা ছড়ায়ে গিয়েছে
চির আঁধারের ভুমে;
অন্ধকারের বন্দীরা আজি
জেগেছে আলোর চুমে।
কণক-বিজলী ছেয়েছে গগন,
ঘুমভাঙাদল মেলেছে নয়ন,
এ নব প্রভাতে রাঙাও ভুবন
নব সুর-কুঙ্কুমে।

বিশ্ব-ভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা;
নিঃস্ব রিক্ত ভাইরা তোমার,
জননী তোমার ক্ষীণা।
পেটে নাই ভাত, মুখে নাই কথা,
বুক পোড়া শুধু নিরাশার ব্যথা,
চির লুণ্ঠিতা বঞ্চিতা মাতা,
মহারাণী—আজি দীনা।

আনন্দ-পুত নন্দন হতে
আনো গান—আনো গান;
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিণী,
শক্তি-সফল প্রাণ।
ভিখারীর দল হয়েছে বাহির,
মুক্তির লাগি পাতিয়াছে শির,
হে চারণ! হের হাসিছে মিহির,
তোল তোল বীণাখান।

গাও সেই গান, যে গানে আবার
জাগিবে শৌর্য্য বল;
গাও সেই গান শত ঝঞ্ঝায়
রবে যাহে অবিকল।

গাও সেই গান, মরমে মরমে
জাগিবে জীবন করমে করমে,
সত্য ন্যায়ের সহজ ধরমে
হইবে সমুজ্জ্বল।

গাও সেই গান, যে গানে ভারত
তিল সহিবেনা আর,
অত্যাচারের রক্ত মূরতি,
অন্যায় ব্যবহার!
যত পাপ এরা করেছে জীবনে,
ভায়ের ঘৃণায়, নারীর বেদনে,
ধুয়ে যাক্ সব বীণা-নিস্বনে
শুষে যাক্ সব ধার।

বিশ্ব-মায়ের অমৃত পুত্র,
ওগো কবি মহাজন!
নিঃস্ব-মায়ের গাঢ় নিশ্বাসে
কাঁদুক তোমার মন।
হে অমর বীণা! জাগাও পরাণ
বাজাও বাজনা, গাহ গান,
মরণ যাত্রি! হও আগুয়ান,
সমুখে সিংহাসন।

মনের লীলা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

'রাঙ্গাদা, আমরা বুঝি মজা দেখতে যাব না! বা-রে!"

"কিসের মজা ভাই?"

"এই যে গড়ের মাঠে কত বাজি হবে, রাস্তায় চারদিকে কত আলো

জলবে! বাঃ, তুমি বুঝি আর জান না। এত লেখাপড়া শিখেছ, এই খবরটা বুঝি আর রাখ না। না, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ।"

"ওঃ, তাই বল্, আচ্ছা তুইই বল্ না, কিসের জন্য এ উৎসব হচ্ছে?"

"বাঃ, তা বুঝি আমি জানি না, আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার মশায় যে বলে দিয়েছেন আমাদের রাজপুত্তুর কলকাতায় এসেছেন, তাই সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এত ধুমধাম করছে। বাতি জ্বালিয়ে সাহেবপাড়া নাকি ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। না, আমি দেখতে যাবই।"

"দেখ কমল, এ উৎসব কারা করছে জানিস্। এ উৎসব দেশের লোক কেউ করছে না, করছে জন কতক সাহেব সুবো যাদের এ দেশের উপর কোন টানই নেই, যারা এ দেশের দুর্দ্দশা দেখে হাসে, আর উৎসব করছে তারা যাদের সঙ্গে দেশের কোন সম্পর্কই নেই যারা সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজীর দল। ভেবে দেখ কমল, যখন দেশে শতকরা নব্বইজন দুবেলা দুগ্রাস অন্ন জোটাতে পারে না, তখন কি না দেশের এত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কিসের উৎসব বল দেখি ভাই, এযে আমাদের বুকের রক্ত নিয়ে তাণ্ডব-লীলা। এখন কি উৎসব করবার সময় ভাই? দেশের যাঁরা প্রাণ হিন্দু মুসলমান, তাঁরা মায়ের কাজে কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন; আর আমরা মজা করে বাজি দেখতে যাব, আর স্ফূর্ত্তি লুটব। ছিঃ ভাই।"

"না রাঙ্গাদা, আমি তোমার অত সব বড় বড় কথা বুঝি না, সকলে যাবে, আমি বুঝি যাব না। আমি যাবই, বা রে।"

"কমল, তুই যদি একান্তই যেতে চাস্ ত যা, আমার তাতে কোনএ আপত্তি নেই। আমার বোঝাবার ভার বোঝালাম। জানিস্ ত আমি কারও স্বাধীন-ইচ্ছার উপর হাত দিই না। তবে আমি ত নিয়ে যেতে পারবনা। আর কেউ যদি তোকে নিয়ে যায় ত সঙ্গে যা।"

কমলরঞ্জন পুলকিত মনে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

"আজ আমাদের ছুটি ওভাই
আজ আমাদের ছুটি;
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।"

* * * * *

উপরের কথাবার্ত্তা সুখরঞ্জন বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলরঞ্জনের মধ্যে হইতেছিল। সুখরঞ্জন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের অধ্যাপনা করিতেছিলেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশভক্তের মুখ দিয়া দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল। সুতরাং সুখরঞ্জন বাবু সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক মনে কংগ্রেসের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রকৃতি খুব নিরীহধরণের ছিল। সে কাহারও স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত না, সুতরাং যখন তাহার কনিষ্ঠ সহোদরেরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল, তখন সে তাহাতে কোনওরূপ আপত্তি করিল না। আজ ২৭শে ডিসেম্বার তারিখে সমপাঠিদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও রাজকুমারের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কমলরঞ্জনের কোমল মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার রাঙ্গাদাদার নিকট আসিয়া আলোক ও বাজি দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অনেক আবদার করার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া সে পাড়ার কোনও সমপাঠীর অভিভাবকের সঙ্গ ধরিতে চলিয়া গেল।

* * * * *

"রাঙ্গাদা, ও রাঙ্গাদা, বেশ মজা হয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র, অমনি দেখি ও বাড়ীর অনাথ, ওইযে অনাথ আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে,—ছিপছিপে ফরসা ছেলেটি যাকে তুমি একদিন খুব বুদ্ধিমানের মত চেহারা বলেছিলে ;—সে আমাকে ডাকতে এসেছে। তারা সব তাদের বাড়ীর গাড়ী করে ময়দানে মজা দেখতে যাচ্ছে, আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছে। যাব? বেশ ত যাই না? তাহলে আর কাউকে আমার খোঁজ করতে হবে না।"

"আচ্ছা, তোর ইচ্ছে হলে যা। আমিত বলেছি তোর ইচ্ছের উপর আমার আপত্তি নেই। তবে সাবধানে যাস্। ঠাণ্ডা বেশী যেন লাগে না, দিন কাল ভাল না। বুঝলি।"

"আচ্ছা, তা আমায় বলতে হবে না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। যাই তা হলে, বুঝলে।"

* * * * *

কমলরঞ্জন চলিয়া গেল। সুখরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে আজ তিন চার বছরের আগেকার কথা। সুখরঞ্জনের পিতা মৃতশয্যায় ছোট পুত্র দুটিকে সুখরঞ্জনের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোকে মানুষ করেছি, এখন ভাইদের তুই মানুষ করে তুল্‌বি।" সে কথা সুখরঞ্জন ভুলে নাই, নিজের সাধ্যমত ভাইদের শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য সে চেষ্টা করিয়াছে। অর্থে যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, স্নেহ দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ ও তার মন্দ জুটে নাই। কিন্তু যখন অত্যাচার ও অবিচারে দেশবাসীর মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আত্মোন্নতির জন্য সকল প্রকার বৈধ উপায়কে শাসকসম্প্রদায় নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইয়া—দেশবাসীর মনে সদাপ্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অসন্তোষ বহ্নিকে পীড়ন ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল, তখন অনেক ভাবিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও সুখরঞ্জন স্থির থাকিতে পারিল না। কত কথা তার মনে পড়িল। তার ভাইদের শিক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, জীবনে ভোগ সুখের কথা, কত বিনিদ্র রজনী সে কাটাইল। একবার ভাবে,—আর না, সময় বহিয়া যায়, তাহার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে মনে সে—একপদ অগ্রসর হয় আবার এস্তপদে সে ফিরিয়া আসে। এক পা, আর এক পা, অমনি মনে পড়ে ভাইদের খাওয়াইবে কেমন করিয়া। জীবন তাহার অসহ্য বোধ হইল। দিবানিশি ভগবান্‌কে ডাকিয়াও সে ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় চাঁদপুরের নিরন্ন, কঙ্কালসার কুলিদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সপাৎ করিয়া কে যেন সুখরঞ্জনকে এক প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিল। না আর ত নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকা চলে না। যা করেন ভগবান্ বলিয়া সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে নামিয়া পড়িল। সত্যই ত কে ব্যাহার আহার দেওয়ার মালিক। মানুষ ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া অহংকে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই মানুষ জীবনে অশান্তিকে ডাকিয়া আনে। তাহাই হউক ভগবান্, তুমি যাহা স্থির করিবে তাহাই হউক এই ভাবিয়া সুখরঞ্জন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। কিছুদিন অভাবে অনটনে অথচ মনের শান্তিতে তাহাদের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু আজ যখন কমলরঞ্জন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অর্থের অভাবে পাড়ার বড়লোকের সঙ্গে উৎসব দেখিতে বাধ্য হইল, তখন সেই বুকের এক পাশে স্তূপাকার

দুঃখরাশি হঠাৎ বড় ভারি বলিয়া বোধ হইল! মনে পড়িল, কত বাসনা আকাঙ্ক্ষার রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া জীবনটাকে রামধনুর মত বিচিত্র করিয়া তুলিবার কল্পনা তাহার ছিল। কিন্তু কি করিবে, দেশের আহ্বানে তাহাকে সাড়া দিতে ত হইবেই। নহিলে যে সে দেশদ্রোহী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সুখরঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

* * * * *

হঠাৎ সুখরঞ্জনের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া কমলরঞ্জন বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুখরঞ্জন বলিয়া উঠিল—"কিরে কমল, গেলিনে যে?" কমলরঞ্জন উত্তর দিল—"না রাঙ্গাদা যাওয়া হল না।"

"কেন রে, কি হল তোর? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

"না, রাঙ্গাদা, কেউ ত কিছু বলে নি।"

"তবে?"

"তবে কেন যে আমার যেতে ইচ্ছে হল না, তা আমি নিজেই বলতে পারি না।"

"কি ব্যাপার, শুনিই না।"

"শোন রাঙ্গাদা, জীবনে আমার এমন কোন দিন হয় নি। আমি কাপড় চোপড় পরে অনাথদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে গেলুম এমন সময়ে আমার বুকের মধ্যটা কেমন করে উঠ ল। এমন আমার কখনো হয় নি। কে যেন মনের ভিতর থেকে মুখ খানা ম্লান করে বলে উঠল —ছিঃ কমল, কোথায় যাস, বুঝতে পারছিস না কারা উৎসব করছে। পেছিয়ে গেলুম, অনাথ এসে হাত ধরে বললে উঠ না ভাই কমল। আবার উঠতে চেষ্টা করলুম, আবার মনের মধ্যে ঐ কথা বেজে উঠ্‌ল। আমি ফিরলাম, অনেক সাধ্য সাধনাতেও আর গাড়ীতে উঠতে গেলাম না। মনে হচ্ছে একখানা করুণ মুখ আমার ভিতর গুমরে গুমরে কাঁদছে, সে মুখখানা যেন আমাদের ভারতমাতার। রাঙ্গাদা, তোমার ইচ্ছাই শেষকালে আমাকেও বশ করলে।"

"ভাই কমল, আমার ইচ্ছা তোমায় বশ করেনি। এ ভগবানের ইচ্ছা। জেনো, সব সময়েই মনে রেখো মানুষের নিজের মনের উপর ও নিজের হাত নেই। তুমি যে আজ অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে ফিরে এলে, এ সেই লীলাময়ের ইচ্ছায়ই হয়েছে, তোমার আমার এতে হাত নেই। ভগবানের হাতে ক্রীড়া-

পুত্তুল আমরা তাঁরই ইঙ্গিতে আমরা স্বরাজের পথে চলেছি। তাঁরই ইচ্ছায় তোমার মত সকলের মনেই আজ এমনি লীলা চলছে। আশীর্ব্বাদ করি এই রকম সব সময়ে বিবেকের বাণীর অনুসরণ করো, সেই হচ্ছে মানুষের চিরন্তন মনের লীলা!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল—

সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।
কিসের লাগিয়া দীপ জ্বালিস্‌রে,
কিসের লাগিয়া সুখে হাসিস্ রে,
উৎসবে তুই কেন মাতিস্ রে
জননী বহে যে শৃঙ্খল ভার;
মুখ ঢাক ভাই মুখ লুকাও রে
দীপ নিভে যাক্ দীপ নিভাওরে
অন্তরে তোর স্থির জাগাওরে
বিষাদখিন্ন মুখখানি মার।
সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ভাষাবিজ্ঞান—ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ—

ইংরেজী Philology শব্দের অর্থ—ভাষা এবং সাহিত্য—ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—

ভাষা ভাব বিনিময়ে উপায়। শুধু শব্দের দ্বারাই যে ভাব বিনিময় করা যায় তাহা নয়। নানারূপ চিহ্ন সঙ্কেতাদির দ্বারাও ভাব বিনিময় ঘটিয়া থাকে।

আর এই ভাব বিনিময় মানুষের মধ্যে যে কেবল প্রচলিত এমন নয়, পশুপক্ষীর ভিতরও ইহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কুকুর, ঘোড়া, হাতী, বানর প্রভৃতি বুদ্ধিমান জীবের সহিত মানুষের ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে। তবে যে অবস্থায় আসিলে ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করা চলে, একমাত্র মানুষেই সেইরূপ ভাষা বলে।

ভাষার উৎপত্তি, পরিণতি, বিভিন্ন আকার ধারণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সাধারণ তথ্য নির্দ্ধারণ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষা এবং ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ কি পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে লিখিত বিবরণ হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

এই প্রসঙ্গে ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাষার চলিত নামগুলির আলোচন সুবিধাজনক হইতে পারে। ইংরেজীতে Science of Language নামটি সুপ্রযোজ্য জার্ম্মাণ ভাষায় এই নাম sprachwissenschaft (sprach=speech=বাক্ wissens chaft=knowledge=বিদ্যা)—ফরাসী নাম Linguistique ইংরেজীতে আরও একটি নাম দেওয়া হয় glottology =the science of Tongues=এইরূপ কত নামই চলিত আছে। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় ভাষা বিজ্ঞান নামটি এই অর্থে ব্যবহার করিব।

ইংরেজীতে যাহাকে comparative Philology অর্থাৎ তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান বলে, তাহাতে ভাষার সমস্ত উপাদান এবং বিভিন্ন বিকাশক্রিয়ার আলোচনা থাকা উচিত। Comparative Grammar অথবা তুলনামূলক ব্যাকরণ ইহা হইতে পৃথক শাস্ত্র। ইহাতে ভাষার গঠন সম্বন্ধীয় নীতি এবং পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা আরও সীমাবদ্ধ ভাবে থাকে (a more limited comparis on of structural principles and methods)। Historical Grammar বা ঐতিহাসিক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থাবিশেষের বর্ণনা এবং ক্রমপরিণতির বিষয় সংগ্রহ করে। Descriptive Grammar: বা বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় আকার প্রকারের বিষয় বর্ণনা করে।

ইংরেজীতে যাহাকে সাধারণত এখন Philology বলা হয়, তাহার আদি অর্থে বুঝাইত—কোনও একটি জাতির চিন্তা পদ্ধতি সভ্যতার বিকাশ ধারা এবং আর্টের পরিচায়ক রচনা বিষয়ে পাণ্ডিত্য পূর্ণ—সাহিত্যিক এবং ভাষা বিষয়ক আলোচনা। (literary and linguistic study and learning concer-

ned with the writings of a people as representive of its thought, style, culture aud art)। ফরাসী এবং ইউরোপীয় অন্যান্য দু একটি ভাষায় এখনও Philology কথাটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এস্থলে অতি সহজ হইলেও একটা কথা সাধারণ পাঠকের নিকট উল্লেখ করিতে চাই। ভাষা এবং সাহিত্য যে এক জিনিস নয়—অনেকে একথা সব সময়ে মনে রাখেন না। ভাষার ইতিহাস এক জিনিস—সাহিত্যের ইতিহাস আর এক জিনিস। আমরা এখানে শুধু ভাষার ইতিহাসের কথাই আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকভাবে এই ইতিহাস আলোচনা করিবার নামই ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের প্রথমেই করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে কোনও বিশিষ্ট ভাবে লক্ষ্য না করিয়া শুধু "ভাষা" এই শব্দটিতে যাহা বুঝায় সাধারণভাবে তাহারই—আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সকল ভাষার অন্তর্নিহিত যে মূল সূত্র গুলি আছে সেগুলি বুঝিতে হইবে।

(১) ভাষার ইতিহাস (History of Language)
(২) অর্থের ইতিহাস (History of Meanings or Semantics)
(৩) ধ্বনির ইতিহাস (History of sounds or phonetics)
(৪) অক্ষরের ইতিহাস (History of writing or Palaeography)
(৫) বিভক্তি-ধাতু-প্রত্যয়াদির ইতিহাস (History of Parts of speech, prefixes suffixes etc. or morphology)
(৬) বাক্‌বিন্যাস রীতির ইতিহাস(History of Sentence structure or syntax)
(৭) প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস (urgeschichte Germant Ur=original, Geschichte=History of Primitive Culture as revealed through words.

এই বিভাগকয়টির ভিতর একটি সম্বন্ধের ধারা আছে। আত্মার বিশিষ্ট শক্তি স্ফুরণের জন্য ভাষার সৃষ্টি হইল। ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অর্থ আরোপিত হইল। সেই অর্থের প্রকাশক দেহ স্বরূপ শব্দের বা ধ্বনির সৃষ্টি হইল। সেই ধ্বনিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য লিপির আবশ্যক হইল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন ধ্বনি সমষ্টির আকারগত প্রভেদ এবং পারিণত

ঘটিল। অনেকগুলি শব্দের সমষ্টি লইয়া বাক্যের বিন্যাসপদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধানতম বিষয় হইল। শব্দের আকার অথবা অর্থের সাহায্যে মানবের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে—তাই এই আলোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গস্বরূপে বিবেচিত হইল।

নির্ভরতা

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

মানুষ যে ভগবানকে পেতে চায় তাও তার নিজের মতন করে। ভগবান যখন বৃন্দাবনের প্রেমময় মূর্ত্তিতে আসেন মানুষের এমনি সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডি যে সে তখন নিজের যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রেমময়ের মাধুর্য্যকে হারিয়ে ফেলে। ভগবান তখন মাতৃরূপে বুকের কাছে টেনে নেন তখন তাঁর উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেখানে মোহকেই দেখে থাকে। স্ত্রীরূপে যখন প্রেমালিঙ্গন করেন তখন কামকেই প্রেমের আসনে স্থান দেয়, বন্ধুরূপে যখন অবতীর্ণ হন তখন স্বার্থকেই বড় করে তোলে। মা অন্নপূর্ণা যখন খাওয়ান দাওয়ান তখন যেন দিন দিন আস্তে আস্তে কেমন একটা সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে। এই প্রেমের মধ্যে, মাধুর্য্যের মধ্যে কোমলতার মধ্যে যে একটা ভগবদ্‌শক্তির বিকাশ তা মানুষ দেখ্‌তে পায় না—মনে করে শক্তিহীন হয়ে যাবে। আবার যখন ভগবান্ ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তি ধরে রুদ্রভাবে অবতীর্ণ হন তখন যেন বুক দুর দুর করে বেঁপে উঠে সেখানে যে প্রেমের বিন্দুমাত্র আভাস আছে তাও মানুষ মনে কর্‌তে পারে না। যখন শত্রুরূপে এসে দেখা দেন তখন হিংসা দ্বেষ মান অভিমান এসে হৃদয় অধিকার করে বসে। তাই মানুষ কোন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যখন ভিতরে কোমলতার বন্যা দিয়ে ভাসিয়ে দেন, সরলতার সাগরে ডুবিয়ে দেন তখন মনে হয় বুঝিবা মানুষ হৃদয়ের কোমলতা ও সরলতার উপর টেক্স বসিয়েছে। সর্ব্বভাবে ভগবান যে পরিপূর্ণ রূপে আমাদের নিকট এসে হাজির হচ্ছেন তা না দেখে আমরা কোমল হতে কঠোর আবার কঠোর হতে কোমল করে তোল্‌পাড় করে থাকি—ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। পরিপূর্ণ সত্তাকে খণ্ড করে দেখ্‌তে চাইলে ভগবান তাতে রাজী নন, তিনি যে চান্ মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে।

এই যে অবস্থা তার মূল কারণ আমাদের অহমিকা ও ভগবদ্‌নির্ভরতার অভাব। আমরা মনে করি আমাদের মঙ্গল আমরা যেমন বুঝি আর কেউ তেমন নয়। বিশ্বাস কর্‌তে পারি নে যে ভগবান্ যখন সংসারে এনেছেন তখন তাঁর যা উদ্দেশ্য তা তিনি অবশ্যই আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন এবং তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র আর তাঁর শক্তি কত বেশী মুখে বল্‌লেও বুঝি না।

তাই যতদিন পর্য্যন্ত আমি কোন বিশেষভাবে সাধনা করে তগবানকে লাভ করব এ অহমিকা মনে থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁকে লাভ করা যাবে না। ভগবান্ সমস্ত গীতায় বিশেষভাবে সাধনার কথা বলে উপসংহারে এই কথাই বলছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

জীবনে অনেকদিন দেখেছি শত চেষ্টা করেও নিজের দুর্ব্বলতাকে দূর কর্‌তে পারি নাই, মনে মনে ভগবানের নির্দ্দয়তার কথাও ভেবেছি, কিন্তু তারপর এখন এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও ভগবান্ আছে, এর মধ্যেও প্রেমময়ের মধুর ভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রয়েছে ভাব্‌তে পেরেছি তখনই দুর্ব্বলতা দূরে গিয়েছে। ভগবান্ এমনি করে দিন দিন কত শিক্ষা দিয়ে কত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে সত্যে নিয়ে যাচ্ছেন। খেলা কর্‌তে কর্‌তে বাপ ছেলেকে মাথার উপর তুলে ধরে ছেলে ভয়ে ভীত হয়, তারপর মুহূর্ত্তেই আবার বুকের কাছে টেনে নেয়ার আনন্দটা আরো আনন্দময় হয়ে উঠে। সংসারে লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্যকে যদি এমনি করে দেখ্‌তে পারা যায় তখন কবির কথাই ঠিক্‌বলে প্রতীয়মান হবে,—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছ গোপন।"

সে প্রেম সে নির্ভরতা জমাট বাঁধলে পরে ভীষণ বিষধর সর্পে দংশন কর্‌লেও বল্‌তে পারে "প্রিয়তমের বার্ত্তাবহ" তাঁরই বারতা জানাইতে এসেছে। পাহাড়ী বাবার জীবনী এইরূপ নির্ভরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। চোর যখন সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে এল তখনও মনে বৈরীভাব আসে নাই, প্রেমময়কে ধরবার জন্য যেমন করে ছোটে তেমনি করে ছুটাছুটি করেছিল। সমস্ত গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমি তো একখানা নির্ভরতার ইতিহাসই দেখ্‌তে পাই, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি খাটিয়ে অর্জ্জুন যখন ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতা হয়েছিল তখনই বলেছিল,—

"যৎ শ্রেয়ো স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাংত্বাং প্রপন্নম্।"

যাহা শ্রেয় তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বলো। বলিতে গেলে ইহাই গীতা শাস্ত্রের আরম্ভ। তখন পর্য্যন্তও অর্জ্জুনের বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই, ভগবৎসত্তার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিতে পারেন নাই, তখনও সন্দেহ আছে, কেবল মাত্র নির্ভরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তারপরে আরো নানাপ্রকারে সর্ব্ববিষয়ে বিশদ আলোচনা গীতার ভাষায় যাকে বল্‌তে পারি "বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষণঃ" গত সন্দেহ হইল তখনই বলিল "করিষ্যে বচনংতব।" ইহাই হইল গীতার শেষ কথা। তাই আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের ভগবান্‌কে যে চাওয়া তাঁকে যে পাওয়া তা তখনই ঠিক্ হবে যখন আমরা সকল প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে অর্জ্জুনের মত বল্‌তে পার্‌ব "করিষ্যে বচনং তব।"

মাতা পুত্র

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

মা। কেন বৎস হেরি তোর বিরস বদন?
কোন্ বিষাদের ছায়া দিয়াছে আঁকিয়া
করুণ ম্লানিমা তোর বদন-সরোজে?
বল মোরে কোন্ ব্যথা বাজে তোর বুকে।

পু। দুর্ভিক্ষের হাহারব উঠিতেছে আজি
দেশের মরম ভেদি', তাই বড় ব্যথা
বাজে বুকে, ভাবি হায় দারুণ বিধাতা
কত দুঃখ লিখেছিল এ দেশের ভালে!
মৃত্যু—মৃত্যু চারিদিকে,—ঘোর অন্ধকার!
মৃত্যুরূপা মাতা যেন পেতেছেন কোল
সকল দেশের তরে, তাই হেথা লোকে
বাঁচিয়া মরিয়া থাকে, মরে' তবে বাঁচে!

মা। তিমির-দেশেতে মোরা পথহারা-জন,
সত্য বটে; কিন্তু এই মরণ-আঁধারে
দহিয়া সোনার রঙ্গে, নব জীবনের
দীপ্ত অগ্নিশিখা কিগো উঠিবে না জ্বলে?
সকলের শেষ আছে—মোদের এ দুখ
অশেষ অনন্ত হ'য়ে রবে চিরদিন?
এই দুঃখ-ব্যধি হ'তে দিতে অব্যাহতি
আছে কোন প্রতীকার—দেখেছ ভাবিয়া?

পুঃ। অনেক ভেবেছি মাগো, কিন্তু দিশাহারা
মনতরী কূলহীন এ চিন্তা সাগরে!

মা। বিরাট এ ভারতের বিপুল জীবনে
কত রোগ, কত শোক, কত দুঃখ রাশি
বিচিত্র আকারে নিত্য আসি দেখা দেয়;
কে এমন মন্ত্রদ্রষ্টা আছে ঋষিবর
বুঝিয়া কারণ তা'র করে প্রতীকার?
আশা-নিরাশার আর আলো-আঁধারের
মায়া-যবনিকা আজি ঢাকিয়াছে দিশি,
অন্তরের দিব্যালোকে তমো-আবরণ
নিমেষে ভেদিয়া তা'র দেখাইবে পথ
যেইজন, তা'রি পথ চেয়ে বসে আছে
নিখিল ভারত, আজি সকল কর্ম্মের
মাঝে, মর্ম্মে নিতি নিতি ধ্বনিছে ক্রন্দন
তা'রি লাগি, শত চেষ্টা, শত অস্থিরতা
যাচিছে তাহার মাঝে লভিতে বিরাম।

পুঃ। হেন জন আসিবেন আমাদের মাঝে?
কতদিনে মিলিবে মা তাঁহার সাক্ষাৎ
আঁধার ভবিষ্যাকাশে আগমন যাঁর
নব জীবনের ঊষা করিবে ঘোষণা?
কিবা তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কিবা তার বাণী?
কিবা তাঁর ধর্ম্ম মাগো? পথহারা জনে

কোন্ পথে ল'য়ে যাবে আলোকের দেশে ?
জান যদি, কহ মাগো, হৃদয় ব্যাকুল !

মা। কেমনে বলিব বাছা, জননী কি তোর
শক্তিরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্ঞানের আধার ?
তোর কাছে মা যে তোর বিশ্ব-বিকাশিনী
বিশ্বের নিকটে সে যে দীন ধূলি কণা !
তা'র মুখে সাজে কিরে এই মহাবাণী ?
দেশভাগ্য-বিধাতার ভবিষ্যৎ কথা
শুনিলে তাহার মুখে, বাতুল বলিয়া
উপহাসি' যাবে সবে, তবে এই জানি,
মাতাপুত্রে বাতুলতা করিয়া রেখেছে
এ ধরণী মোহনীয়া সহজ সরল।
তবে আজ আয় বাছা, মাতাপুত্রে মিলি
অর্থহীন বাতুলতা প্রকাশি ধরায় ;
পাগলে বুঝুক শুধু পাগলের কথা।
কেবা সে, একক, কিংবা বহুজন হ'য়ে
আসিবে মোদের মাঝে জানিনা কিছুই।
শুধু এই মনে হয়—মহাভারতের
অন্তর্গূঢ় দীর্ঘতম সংহত সাধনা
বাহিরের মূর্ত্তি ল'য়ে হইবে প্রকাশ,
এক কিংবা বহু হয়ে আত্ম প্রয়োজনে ;
কাল পূর্ণ হ'বে যবে আসিবে সে জন।
শতদল কাটায়েছে তিমির রজনী,
নবীন উষার তরে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ;
সে নব জীবন রবি যেদিন হাসিবে
সে দিন হাসিবে সেও শত দল মেলি'।
ধর্ম্ম তা'র, বাণী তা'র সহজ উদার
নিত্য স্বচ্ছ আলো আর বাতাসের মত।
'শান্তি' 'সামঞ্জস্য' বহি' বরাভয় করে,
প্রশান্ত অভয় মূর্ত্তি, দেখা দিবতা'রে।

প্রতিমর্ম্মে, প্রতিকর্ম্মে, প্রতি বাক্যে তা'র,
সে শান্তি অমিয়-মধু পড়িবে ক্ষরিয়া,
পিয়ে তাহা হিংসা-অগ্নি লভিবে নির্ব্বাণ,
ভাই ভাই এক হবে ভুলিয়া বিদ্বেষ।
সর্ব্ব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে, সকল বিরোধ
তার মাঝে অবিরোধে লভিবে বিরাম।
সকল জ্ঞানের পরে বিজ্ঞানের ভূমে
স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে সে যে ভাসাবে ধরণী,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি ধারা ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
গৈরিকের বিলাসিতা ঘুচাবে সে জন,
গৃহীর ঘুচাবে সে যে গৃহ-মাদকতা ;
ঘর আর বাহিরের সুচির বিরোধ
ঘুচাইয়া মিলাবে সে ত্যাগে আর ভোগে,
কোমল কঠোর মিলি' হৃদয় তাহার
অর্দ্ধ-নারীশ্বর-রূপী—বাণীতে তাহার
পুরুষ নারীর মাঝে মহা আবরণ
ছিন্ন হ'বে চিরতরে। নবীন প্রভাত
আসিবে জগতীতলে ; হেরিবে সকলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য নবরাগে এক হ'য়ে যাবে—
নারায়ণ জাগিবেন সংসারের প্রাণে।

দ্রাবিড়জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ]

মানব সভ্যতার প্রথমযুগে যখন মানবজাতি অভাবক্লিষ্ট হয় নাই ; যখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র মানবের অবস্থিতি বশতঃ ভূসম্পত্তি বা বাসস্থানের জন্য পরস্পর বিবাদ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই ; যখন বাণিজ্য বা দালালির অত্যাচারে দরিদ্রা ভারাক্রান্ত হয় নাই ; তখন

মাসিডোনাধিপতি মহাবীর সিকন্দরের ন্যায় কোনও মহাবীরের দিগ্বিজয় প্রয়াস জন্মে নাই। তখন বিরাট বিশাল বসুন্ধরা ভিন্ন ভিন্ন মানবের সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া মানবের সম্পর্কজাত 'দখল' বা অধিকার-সত্ত্বের সীমানারেখারূপ কোটি কোটি ঋজু বক্র রেখায় কলঙ্কিত হয় নাই। কারণ স্থানাভাবরূপ আবশ্যকতা তখনও প্রাগৈতিহাসিক মানবকে চিন্তাক্লিষ্ট করে নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না থাকিলেও মানবজাতি কখনও পরস্পর বিবাদ করিবার কারণের অসদ্ভাব বোধ করে নাই। গ্রাসাচ্ছাদন বা আবাসভূমির অভাবের অভাবে মানবের বিবাদের হেতু হইয়াছে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। তোমার ধর্ম্মবিশ্বাসে যদি আমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তোমাতে আমাতে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। সে প্রকার বিভিন্নমুখী সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে একতরের বিনাশ যদি সম্ভবপর না হয় তবে পরস্পরের সম্পর্কত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কারণেই ভারতে আর্য্য ও অন্-আর্য্যজাতির বিবাদ; এই কারণেই ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য্যগণের বিবাদ; এই কারণেই আরব ও পারস্যের দুই জাতির বিবাদ। আরও কত-কত জাতির মধ্যে যে এই কারণে বিবাদ হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই বিবাদের একটা অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে এই যে প্রাচীন কালের মানবগণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ জাতির সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, পৃথক্ পৃথক্ সভ্যতা ও পৃথক্ পৃথক্ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং জাতিতত্ত্ব বিষয়ে কোনও আলোচনা করিতে গেলে জাতিগত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মানবজাতির আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের উপর সর্ব্বত্রই একটা আধ্যাত্মিক ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে প্রকার জটিলভাবে মানবজাতির গতিবিধি ও পরস্পর সম্পর্ক ও সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে সে জটিলতাজাল ভেদ করিতে হইলে মানবজাতি সংক্রান্ত নানা বিষয়িণী আলোচনা আবশ্যক। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের আলোচনা, বিনা অন্য বিভাগের আলোচনায় উপযুক্তরূপ ফল প্রসব করিতে পারে না। হয়ত প্রকৃত আলোচনার ফলে একদিন জানা যাইবে যে ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডের দুইটী প্রধান জাতি, অর্থাৎ আর্য্যজাতি ও শকজাতি মূলতঃ একই জাতি। প্রাচীনকালে ধর্ম্মবিশ্বাসাদি কোনও কারণে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে এই উভয় জাতি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক ইউরোপ ও এসিয়ার সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছে তাহাতে জটিলতার জাল

ভেদ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। হয়ত এ জটিলতাজাল ভেদ হইলে একদিন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই; হয়ত একদিন কোনও মনস্বীর আবিষ্কার প্রমাণিত "God hath made of one flood all nations of men, to dwell upon the face of the whole earth." তখন মানবে মানবে বিশ্বপ্রেমিকতার সূত্রপাত হইবে; সকলে স্বীকার করিবে এক ভগবানের সন্তান মানবগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ভিন্ন অন্যভাব থাকিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের দুইটী প্রধান জাতি—আর্য্য ও দ্রাবিড়। এই দুই জাতি যেভাবে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া শত শত বৎসর ধরিয়া পরস্পরের উপরে পরস্পরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে কোন্‌টী মূলপ্রবাহের জল ও কোন্‌টী উপনদী প্রবাহে আগত তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই কঠিন। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গণ এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করেন এবং আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছেন। উভয় জাতির মিলনে এমন একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে যে দ্রাবিড়গণ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে নিজেদের মৌলিক উপাদান বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মৌলিকতার দলিলে আর্য্য সভ্যতার যে ছাপ পড়িয়াছে তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি দুষ্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালের ধর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে বড় বেশী জটীলতা স্থান পাইত না, স্বভাব সরল ভাবের প্রথম উচ্ছ্বাসে যে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিত তাহাতে সরলতাই পরিস্ফুট হইত। এবং তাহার ফলে প্রাচীন কালের ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপদ্ধতি সমূহের মধ্যে সীমারেখা বড় স্থূলভাবে অঙ্কিত করা যায়, অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আবশ্যক হয় না। সুচতুর চিত্রশিল্পী যেমন বৈসাদৃশ্য প্রধান বর্ণসমূহের নিকট বিন্যাস দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রে মনোমুগ্ধকর চিত্রের মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বনাম ধন্য হইয়া পড়েন, প্রাচীন ধর্ম্মমতসমূহেও সেই প্রকার বিভিন্নমুখিতা স্বতঃ প্রকাশ। এ যেন 'কালোর পাশে সাদা' বা 'শ্যামের বামে রাইকিশোরী'। উভয়ের বিভিন্নতা এতই প্রতিমুখী, এতই স্বপ্রকাশ, যে যে ভাবেই তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া থাকুক না, তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে না, চোখের সাম্‌নে ভাসিতে থাকে। সেইজন্য দ্রাবিড়গণের ধর্ম্মমতে আর্য্য ধর্ম্মের প্রবল ছাপ পড়া সত্ত্বেও উভয়ধর্ম্মের উপাদানের বিশ্লেষণ কঠিন হয় নাই। প্রাচীন

আর্য্যধর্ম্মের প্রধান উপাদান সূর্য্য, চন্দ্র, আপোদেবতা, অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, দ্যৌঃ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বস্তু হইতে দেবতা কল্পনা; কতিপয় নরনারীর (অবতারভূত) দেবত্ব কল্পনা; এবং দেবতাও নরজাতির মধ্যবর্ত্তী একটী বংশগত পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি। এই সকল মৌলিক উপাদান যে ধর্ম্মে লক্ষিত হইবে, অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে হয় সে ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন না হয় আর্য্য ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভান্বিত।

সাইবিরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তুর্কী, হাঙ্গারী, ফিন্‌লণ্ড, লাপলণ্ড প্রভৃতি সুর স্থানে যে সকল জাতি বর্ত্তমান যুগে বসবাস করিতেছেন তাঁহারাই শক (Scythian) জাতি বা তুরাণীয় জাতি। এই শকজাতি ও দ্রাবিড় জাতির ঐক্যমূলক মতবাদ সত্য হউক আর নাই হউক, ভাষা ও ধর্ম্মবিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে বিলক্ষণ অনুরূপতা আছে সন্দেহ নাই। শকজাতি ও দ্রাবিড় জাতির ধর্ম্মে চারিটী অনুরূপ উপাদান লক্ষিত হয়।

(১) বংশগত পুরোহিত শ্রেণী ইঁহাদের নাই। দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে দালালি করিবার জন্য পুরোহিত বা পাণ্ডার আবশ্যক ইঁহাদের হয় নাই। ইঁহাদের গৃহস্বামী বা কর্ত্তা আবশ্যক হইলে পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য করেন। ইচ্ছা করিলে যে কেহ এ কার্য্য করিতে পারেন, এজন্য বর্ণবিচার নাই। সময়ে সময়ে বা প্রদেশ বিদেশে গ্রামের মোড়ল পুরোহিতের কার্য্য করেন। যখন তিনি এ কর্ম্ম করেন তখন তিনি তাঁহাদের উপাস্য দৈত্য বা ভূতের প্রতিনিধি ও মুখস্বরূপ।

(২) তাঁহারা অদ্বিতীয় ভগবানের সত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার পূজা বা উপাসনা করেন না। কারণ ইঁহাদের মতে ভগবান্ এত 'ভালমানুষ' নয় ভাল বা মন্দ তিনি কিছুই করিতে পারেন না।

(৩) ভগবানের অর্চ্চনা না করিলেও ইঁহারা দৈত্য বা ভূতের পূজা করেন। কারণ ভূত বা দৈত্য নিষ্ঠুরতার অবতার প্রতিহিংসা পরায়ণ এবং অব্যবস্থিত চিত্ত। সুতরাং ইঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে। শাণিতাদির দ্বারা অর্চ্চনা ও তাণ্ডব নৃত্যে ইনি পরিতুষ্ট হয়েন।

(৪) জন্মান্তরবাদ ইঁহাদেয় নাই। ইঁহারা "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" মতবাদী।

সাইবিরিয়া, মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পর্য্যটকগণ সে সকল দেশের দৈত্যপূজক শকদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে-সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

লিখিয়াছেন। কাম্বোডিয়ার প্রদেশে ষ্টীণ (stiens) দিগের মধ্যে এই প্রকার চিকিৎসার কথা মোহট্ (Mouhot) রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটীর পত্রিকায় লিখিয়াছেন। তান্ত্রিকগণের মধ্যে এই ভূত-পূজা, তাল-বেতাল সিদ্ধি ও শব সাধনা রূপে সংক্রামিত হইয়াছে এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বহু স্থানে এই প্রকার ভূত পূজা ও 'ভর' দেখা যায়। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে মুসলমান দরবেশগণও এই প্রকার উৎকট অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইউরোপ ও এসিয়ার সর্ব্বত্রই হিন্দু, মুসলমান ও রোমান ক্যাথলিকগণের মধ্যে অল্প বিস্তর এই ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া মনে হয় যে শকগণ যেমন যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছে সেই সকল স্থানেই তাহাদের সংস্রবে তাহাদের ধর্ম্মের প্রভাব নিম্ন ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে সংক্রামিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের তিনিবেলী (Tinnevelly) অঞ্চলে 'শাণার'দিগের দৈত্যোপসনা প্রণালীর নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

যখন কোনও দৈত্য বা ভূতের পূজা দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন এক জন পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। দেবোপাসকদিগের ন্যায় এই দৈত্যোপাসক পুরোহিতের কোন ও জাতি বা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট নাই। যে কেহ এই কার্য্য করিতে পারে, পুরুষ হউক, স্ত্রীলোক হউক, কোনও বাধা নাই। ইঁহাদের নাম ভূত-নাচা' (devil-dancer)। সাধারণতঃ যিনি গ্রামের মণ্ডল বা headman স্থানীয়, কিম্বা ঐ প্রকার এক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি তিনিই এ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ভক্তগণের মধ্যে ও ইচ্ছা করিয়া কেহ কেহ এই কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখিয়া ভাবাবেশ হইলেও কেহ কেহ অকস্মাৎ 'পুরোহিত' বা 'ভূত নাচা' হইয়া পড়েন। যে ভূতের অর্চ্চনা করিতে হইবে তাঁহাকে পছন্দ মত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পুরোহিতকে পরিধান করিতে হইবে। ভূতের ইচ্ছানুরূপ পরিচ্ছদ ধারণের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ দর্শক ও উপাসক বৃন্দের ভীতি-উৎপাদন। কিন্তু পরিচ্ছদ, শিরোভূষণ, অলঙ্কার, ত্রিশূল ও ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ একত্র দেখিলে নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কষ্টকর হয়। ঢাক শিঙাই ইঁহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র বা এক-ঘেয়ে বিকট উচ্চধ্বনি করিবার সাধন। অবস্থাপন্ন লোকে আজ কাল clarionet এর আমদানি করে। ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ শব্দ করিবার জন্য এক প্রকার ধনুক ইঁহাদের প্রিয় যন্ত্র। শিবের ধনুকের ন্যায় এই ধনুকের বিশাল আয়তন। বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও ঘুঙুর এই ধনুকে বাঁধা থাকে। এক খানি বিশাল পিত্তল

পাত্রের উপর ধনুকটী অবস্থিত থাকে এবং ধনুকের গুণ এরূপ শক্ত ভাবে বাঁধা থাকে যে টান দিলেই ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। ধনুকে যে শর সংলগ্ন থাকে তাহাতে টান দিলে পিত্তল পাত্রে লাগে। কেহ কেহ হাত দিয়া পিত্তল পাত্রে আঘাত করিতে থাকে। ফলে এরূপ বিকট শব্দ হয় যে সেখানে পাঁচ মিনিট থাকিলে কাণে তালা লাগে। যখন আয়োজন সম্পূর্ণ হয়, তখন এই 'সঙ্গীত' বা বিকট বাদ্যধ্বনি কমিতে থাকে। পুরোহিত বা 'ভূতনাচা' তখন শুদ্ধ ভাবে সংজ্ঞাহীন যষ্টির ন্যায় দণ্ডায়মান হয়েন, কিম্বা ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতার সহিত ধীরে বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি তিনি ধীরে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকেন। কখনও কখনও কার্য্যের সুবিধার জন্য মদ্যাদি পান করেন, নিজের শরীর কাটিয়া শোণিত নির্গত করেন, স্থূল ও দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা নিজের শরীরে আঘাত করিতে থাকেন, জ্বলন্ত মশাল নিজের বুকে টিপিতে থাকেন, নিজের ক্ষতস্থান হইতে-নির্গত রক্ত পান করিতে থাকেন, অথবা বলি স্বরূপ ছাগের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার গলায় মুখ দিয়া রক্ত ধারা পান করেন। তাহার পর নূতন জীবন প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ঘুঙুর যুক্ত রজ্জু-যষ্টি ঘন ঘন সঞ্চালন করিতে থাকেন, এবং ঘন ঘন উন্মত্তের ন্যায় অনিয়ত পদ বিক্ষেপে লাফাইতে থাকেন। এই অবস্থায় অকস্মাৎ ভূতের আবেশ হয়। সে ক্ষিপ্ত দৃষ্টি ও উন্মত্ত উল্লম্ফন দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে তাঁহার মধ্যে ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে। ভূত তাঁহাকে এরূপ ভাবে পাইয়া বসেন যে তাঁহার জ্ঞান বাক্ শক্তি সম্পূর্ণ রূপে ভূতের ইচ্ছাধীন হয়। এই অবস্থা ঘোষণা করিবার জন্য জনসংঘের মধ্যে একটী ক্রমশঃ কম্পমান কোলাহলধ্বনি উত্থিত হয়। তখন দেবতা জ্ঞানে সকলে 'ভূতনাচা'র পূজা করেন। তাহার পরে উপস্থিত জনসংঘ তাঁহাদের পীড়া, অভাব সুখসমৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। 'ভূত-নাচা' অর্থশূন্য ও দ্ব্যর্থযুক্ত অর্দ্ধ স্ফুট এক একটী শব্দ বা সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাদের কথার উত্তর দেন এবং ভক্তগণ নিজেদের ইচ্ছা ও কামনার অনুকূল নানা অর্থ কল্পনা করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন।*

কর্ণেল ম্যার্শ্যান (colonel Morshall) নীল গিরি পাহাড়ের তুদা-দিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ক্রম বিকাশের খুঁটি নাটি বিবরণ দিয়াছেন। ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি আর্য্য ধর্ম্মের উপাদানের সহিত এরূপ ভাবে

*Bishop Caldwell's paper on Shanar demonolatrous rites of Tinnevelly quoted in his comparative Dravidian Grammar.

তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের বা দৈত্যপূজার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া ভারতীয় দ্রাবিড়গণের প্রাচীন দৈত্য পূজার সহিত তাহার তুলনা করিব। এই সকল পর্য্যটকগণের মধ্যে মার্কো পোলো (Marco Polo) ও কর্ণেল য়ুল (Colonel Yule) প্রধান।

যখন ইহাদিগের পুরোহিত বা ঐন্দ্রজালিক (বা oracle) এর 'ভ'র হয়, তখন তিনি এক প্রকার পরিচ্ছেদ পরিধান করেন। এই পরিচ্ছদের প্রান্ত-ভাগে ও নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ঘুঙুর', ঘণ্টা, লৌহ খণ্ড ও লৌহবলয় সংলগ্ন থাকে। যখন পুরোহিত তাঁহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তখন ধূপ-গন্ধ দেবায়তন (বা পিশাচায়তন) গন্ধিত হইয়া উঠে, দর্শকবৃন্দ করতাল ও কাংস্য বাদ্য করিতে থাকেন, ঘণ্টা-কাঁসর বাজিতে থাকে। পুরোহিত বাম হস্তে ডমরু বাদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে কাঁপিতে আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ কম্পন ও অঙ্গ-সঞ্চালন কার্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন, চীৎকারের বিকটতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বশরীর অদ্ভুত ভাবে বক্রতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে তিনি ছুরি লইয়া স্বশরীরে আঘাত করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে দর্শক বৃন্দ বুঝিতে পারেন যে পুরোহিত বা 'শমনের শরীরে ভূতাবেশ হইয়াছে এবং তখন তাঁহাকে স্বয়ং ভূত বলিয়া দর্শকবৃন্দ বিশ্বাস করেন। অবশেষে 'শমন' বা পুরোহিত যখন 'ভরে' ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া যান তখন তিনি যে কথা বলেন তাহা স্বয়ং 'ভূত' বা দেবতার বাণী বলিয়া গৃহীত হয়। সাইবিরিয়া, মাঞ্চুরিয়া মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে শক-জাতির মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণাত্যের টিনেভেলি (Tinnevelly) অঞ্চলে এবং অনেক স্থানে বুদ্ধ ধর্ম্মিগণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। ইহাদের পীড়া হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-কবিরাজ প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে ডাকা হয় না। সেরূপ অবস্থায় ইহারা ভূতের ওঝা বা 'শমন' দিগকে ডাকাইয়া আনেন। ওঝারা নানারূপ বাদ্যযন্ত্র ও ভূত বশী-করণের নানা সাধন লইয়া পীড়িতের মুখে পীড়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহারা ভেরী-পটহ-ডমরু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও বংশী বাদন করিতে করিতে তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গীত, কোলাহল ও তাণ্ডব নৃত্য উৎকট ভাবে চলিতে থাকে এবং কিয়ৎকাল পরে ওঝাদের মধ্যে একজন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া যান। তখন ইহার শরীরে ভূতাবেশ হয়। অন্য ওঝা ও 'শমন'গণ তখন ইহাকে

পীড়িতের বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন। আবিষ্ট ওঝা তখন বলিতে আরম্ভ করেন, "অমুক স্থানে অমুক ভূতের নিকট অমুক ভূত অপরাধ হেতু পীড়িতের উপর তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।', তখন তাঁহার সহচরগণ—বলিবেন, "আমরা প্রার্থনা করি আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন এবং ইহার জীবনের বিনিময়ে ধনসম্পত্তি ও বলি গ্রহণ করুন। ইহাকে বাঁচাইয়া দিন।" ইহার উত্তরে ভূত (বা ভূতাবিষ্ট শমন) বলিবেন, (যদি রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা না থাকে), "রোগী অন্য একজন ভূতের নিকট ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। আমি ক্ষমা করিলেও তিনি ক্ষমা করিবেন না।" এ উত্তর পাইলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে রোগী বাঁচিবে না। যদি বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে উত্তর হইবে, "একটী পীতবর্ণ, একটী শ্বেত-পীত ও একটী মিশ্র বর্ণে—এই প্রকার তিনটী-মেষ, একটী কৃষ্ণবর্ণ ছাগ, দ্বাদশ জালা সুগন্ধি ও নানাবিধ মসলা দেওয়া মদ্য ও অন্যান্য নানাবিধ উপহার পাইলে ইনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং রোগীকে ছাড়িয়া দিবেন।" অন্য নানাবিধ উপহারেরও নির্দ্দেশ হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে নর বলির ও বিধান হয়। ছাগ-মেষ-মহিষাদি কি প্রকারের এবং কি বর্ণের হইবে এবং কত সংখ্যা হইবে তাহার নির্দ্দেশ হয় এবং কত সংখ্যক 'শমন' বা ওঝা একত্র করিতে হইবে, কি প্রকার ভোজ হইবে, ইত্যাদি নানা আড়ম্বরের কথা আবিষ্ট শমনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলে তদনুরূপ ভোজ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে বলির রক্ত ছড়াইয়া দেওয়া হইলে ভূত প্রসন্ন হয়েন। অবশেষে পুরুষ ও রমণীগণ একত্র হইয়া মদ্যপানানন্তর সঙ্গীত ও তাণ্ডব নৃত্য সহ মদ্য ও মাংস ছড়াইতে ছড়াইতে নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। পর্য্যটন কালে একজন 'শমন' পুনরায় মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত হয়েন। তখন সহচরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি রোগীকে ক্ষমা করিয়াছেন কিনা। তখন তিনি যদি 'হাঁ' বলেন তাহা হইলে রোগী রোগ মুক্ত হয়। নতুবা তিনি কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটির উল্লেখ করিয়া পুনরায় সেই অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করেন। এবং আদেশ প্রতিপালিত হয়। এইরূপে ইহাদের চিকিৎসার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

হিমালয় অঞ্চলে 'কেজে' ও 'ধিমাল' দিগের মধ্যে এই প্রকার চিকিৎসা প্রণালীর কথা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় হগসন (Hodgson)

মিশিয়া গিয়াছে যে ইঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্য হইতে দ্রাবিড়ী ছাপটী বিশ্লেষণ করা সুকঠিন। ইঁহারা পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন; প্রেতদিগের তৃপ্তি বা শান্তির জন্য যজ্ঞাদি নানাবিধ অনুষ্ঠান করেন; যজ্ঞাদিতে দুগ্ধ ও ঘৃতের সমধিক ব্যবহার করেন; পৌত্তলিকতা মানেন না; তাঁহাদের মন্দিরে প্রলম্বিত একটী ঘণ্টাকে খুব ভক্তি করেন; মাংসভোজন করেন না; ফলমূল, কৃষিজাত শস্য ও দুগ্ধাদি খাইয়া জীবন ধারণ করেন; রমণীগণকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষমতা, এমন কি মন্দির প্রবেশের অধিকার পর্য্যন্ত দেন না; তাঁহাদের রমণীগণের এককালে বহু পুরুষের সহিত বিবাহ হয়; ইঁহারা গো জাতিকে অত্যন্ত ভক্তি করেন; গোয়ালা জাতিকে পুরোহিতের ন্যায় সমাদর করেন; বংশগত (কিন্তু জাতি বা বর্ণগত নহে) এক শ্রেণীর পুরোহিত মানেন; দেবতা মানেন, এবং দেবতাদিগের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা (উসুরু স্বামি) স্বীকার করেন; অন্ধকার অপেক্ষা আলোকের সমাদর করেন; নদী, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি কোনও প্রাকৃতিক বস্তু বা দৃশ্যকে দেবতা জ্ঞান করেন না; দেবতাদিগের নিকট কোনও বলিদান করেন না;—নরবলি, পশুবলি, বা কোনও অর্ঘ্যাদিও দেন না; ফলমূলপুষ্পাদি সহযোগে দেবপূজা করেন না; তপস্যা বা আত্মনির্য্যাতন করেন না; জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, কিন্তু আত্মা ও দেহে প্রভেদ কল্পনা করেন না; তন্ত্র-মন্ত্র ও ভূত প্রেতের শক্তিতে বিশ্বাস করেন; এবং মৃতের সৎকার ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

ইহাঁদিগের এই সকল অনুষ্ঠানে আর্য্য দ্রাবিড়ী উপকরণ সমান পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রণালী বহু মনস্বী বিশেষজ্ঞের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ইঁহারা হিন্দুদিগের শবদাহ করেন বটে, কিন্তু শবদেহের ভস্মাবশেষ বোধ হয় ইঁহারা প্রাচীনকালে কারুকার্য্য-খচিত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ নানাবিধ মৃণ্ময় পাত্র আবৃত জালার মধ্যে রাখিয়া দিতেন। কারণ নীলগিরি অঞ্চলে বিবিধ কারুকার্য্যখচিত অতি প্রাচীন বহু মৃৎপাত্র মধ্যে শবদেহের ভস্মাবশেষ বা অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পাত্রের কারুকার্য্য নির্ম্মাণ কৌশল ও উপরের গ্লেজ্ (glaze) বা চাকচিক্য দেখিলে কুম্ভকারের সভ্যতার পরিমাণ অল্প মনে করা যায় না। * এই প্রকার

* Dr. Hunter. of the Madras School of Art, an eminent authority in these matters, explains that this is not what is technically called glaze, but a peculiar, skilfully executed polish.—Indian Antiquary 1873; a paper by the Rev. Mr. Phillips.

বহু প্রাচীন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী অন্ততঃ ৮০০ বৎসরের হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান কালের তুদাগণ বা নীলগিরি অঞ্চলের কোন জাতিই এই মৃৎপাত্রসমূহকে নিজেদের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না! ইংরাজী উপন্যাস লেখক কর্ণেল মেডোজ টেলার (Colonel Meadows Taylor) ফেরোজাবাদের নিকট এই শ্রেণীর বহু মৃৎপাত্র দেখিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দেন "Scytho-Celtic" বা "Scytho-Druidical." দাক্ষিণাত্য ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য নানা স্থানেও এই প্রকার বহু বিচিত্র মৃৎপাত্রাদির আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু যে জাতির বাসভূমির সন্নিকটে এসকল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাঁহারা এবিষয়ে কোনও সন্ধান দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান কালে তুদাগণ হিন্দুদিগের ন্যায় শবদাহ করেন, ভস্মাবশেষ রাখিয়া দেন না।

ইংলণ্ড, গল্ (Gaul) ও জর্ম্মণীতে কেল্ট (Celt) দিগের মধ্যে যে ড্রুইড (Druid) ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এই প্রকার মৃৎপাত্রমধ্যে মৃতদেহের ভস্মাবশেষ রাখিয়া দেওয়া সেই ধর্ম্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইঁহাদের মৃণ্ময় বা প্রস্তর নির্ম্মিত চক্রাকার Cromlech ভারতবর্ষের এই সকল পাত্রাদির অনুরূপ। ইহাদেরও এই প্রকার মৃৎপাত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু ড্রুইডধর্ম্মীদিগের এ সভ্যতা কেল্টদিগের অপেক্ষা বহু প্রাচীন। সুতরাং ইহা কেল্টদিগের নিজস্ব নহে। ফিনলণ্ড, ইউরেস্কিয়া প্রভৃতি স্থানের শক (Scythian) গণের মধ্যেও এই প্রকার মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে মৃতদেহের ভস্মাবশেষ রাখিবার পদ্ধতি ছিল; এবং কেল্টগণ ইঁহাদিগের নিকট এটী পাইয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। এসিয়ার উত্তরে ও মধ্য ভাগে বহুস্থানে শকদিগের মধ্যে এ পদ্ধতি দেখা গিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ত কেল্টগণও আসেন নাই, ড্রুইডগণও আসেন নাই। তবে কি প্রকারে এই সকল মৃণ্ময় শবাধারে ভারত ছাইয়া পড়িয়াছে। দ্রাবিড়গণ সাধারণতঃ বলেন যে ত্রেতা যুগের মনুষ্যগণ ঐ সকল পাত্র বা জালাতে আবদ্ধ আছেন। কিন্তু 'অজরেম্' নামক এক প্রকার 'প্রস্তর চক্র' বা Cromlech প্রাচীন তুদাদিগের সম্পত্তি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে; কারণ বর্ত্তমান তুদাগণ এই প্রকার প্রস্তর চক্র শবদাহ কার্য্যে ব্যবহার করেন, সুতরাং বর্ত্তমান তুদাগণের শবদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সাক্ষ্য, ও দ্রাবিড়গণের ত্রেতাযুগ বিষয়ক প্রবাদের সাক্ষ্য হইতে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে যে এই

সকল প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন দ্রাবিড়গণের নিজস্ব; তাঁহারা স্বীকার করুন আর নাই করুন।

ইউরোপ ও এসিয়ার শকপ্রধান বহুদেশে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব হইতে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে দ্রাবিড়গণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে শক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যাঁহাদের ভাষা তাঁহাদের ভাষা হইয়াছে, সেই শকজাতির সাধারণ সম্পত্তি এই শবদাহ-পদ্ধতি তাহার ভস্মাবশেষ সংরক্ষণ প্রণালী এবং সেই সঙ্গে এই প্রকার মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের শিল্প। এই সকল সভ্যতার উপকরণ এবং তাঁহাদের ভাষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া দ্রাবিড়গণ অন্যান্য শকজাতিকে ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন। তৎপরে হিন্দুদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দু হইয়া আপনাদিগের প্রাচীন সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

সপ্তদশ অধ্যায়

এই যজ্ঞভঙ্গের ফলে ভোলানাথের সহিত তাহার ভ্রাতৃজায়ার যে মনোমালিন্যের সূচনা হয় যাহা তখন সেরূপ মাত্রাধিক্যে পরিণত না হইলেও পরে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করে। যজ্ঞেশ্বরী নিজের চরিত্রগুণে সব দিক সামলাইয়া চলিতেছিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ পুরুষত্ব ও চিত্তবল থাকিলে কাঁটা কোটাকে অগ্রাহ্য করা যায় ভোলানাথের তাহা ছিল না; পথে ঘাটে সে বিদ্রূপের বাণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উঠিল; শত্রুদলের বাড়ী কোন কাজকর্ম্ম হইলে তাহার নিমন্ত্রণ হইত না; স্কুলের চাকরীও রাখা সঙ্কটাপন্ন হইত যদি না মহেশ ভবানীর স্কুলের উপর জাগ্রত দৃষ্টিকে ভয় করিত। তবে পূর্ব্বের মত সুখে চাকরী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশের ভয়ে যজ্ঞেশ্বরীকে প্রকাশ্যে সে কিছু বলিতে পারিত না, অথচ বাড়ীতে সে বিরক্ত হইয়া থাকিত। একান্নে থাকাতেই তাহার এই শাস্তি ঘটিল, ঘটিতেছে ও আরো ঘটিবে সে প্রত্যক্ষে না পারুক পরোক্ষে ভাবে ইঙ্গিতে কথায় ও কাজে যেখানে সেখানে জানাইতে ছাড়িত না; যজ্ঞেশ্বরী কখনো চাপিয়া ধরিলে সে মিথ্যার আড়ালে

আত্মগোপন করিত। অবশেষে একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে পলাইয়া যাইবার কল্পনাও করিতে হয়। ভোলানাথ লুকাইয়া তেজারতী করিত; দায় দৈবে পাড়ার লোক ভোলানাথের কাছে দু দশ টাকা কর্জ্জ করিত। তারামণির পিশি ব্রহ্ম ঠাকরুণের অসুখ হওয়াতে চিকিৎসার জন্যে তারা—ভোলানাথের কাছ হইতে পাঁচটি টাকা কর্জ্জ করে। তারামণি কন্যা সন্ধ্যার একযোড়া মল বন্ধক রাখে। শুধিতে পারিব না বুঝিয়া তারামণি ভোলানাথকে উহা বেচিয়া ফেলিতে বলে। ভোলা এই উপলক্ষে তারামণির সহিত প্রায়ই দেখা করিত; একদিন সন্ধ্যার পর তাগাদা করিয়া ফিরিবার পথে ভোলানাথ বিক্রীত মালের দাম ১৭টাকা হইতে নিজ সুদ আসল প্রাপ্য মিটাইয়া লইয়া বাকী ফেরৎ দেয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা; ঐ সময়ে জীবন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ব্রহ্মঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে ভোলানাথকে ঘর হইতে দেখিতে পায়; ভোলানাথ তাহাকে দেখে নাই, ভোলানাথ তারাকে ডাকিতে ইতঃস্তত করিয়া চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী তাহাকে শুনাইয়া প্রতিবেশীনী ঈশানভগ্নীকে ডাকিয়া কহিল "আহা ভোলা ছোঁড়া যেন কি হয়ে গেছে ভাজ্‌টাকে এনে পুষ্‌ছে গা আর মাগী উল্টে ছোঁড়ার হাল করে ছেড়ে দিলে; সে দিন ঘাটে বলছে··· ওর মুখ দেখানো ভার হবে বলে আমি তো কোট্ ছাড়তে পারিনি যা ভালো বুঝবো তা করবো দেওরের খাইনি যে তাকে ভয় করবো সে আমার নিন্দে করে দুর্নাম করে করুক, কেয়ার বড় গাঁয়ের জমিদারকে করি তা ত দেওর!" —ঈশানভগ্নী কাদম্বিনী বলিল—"ওমা তাই নাকি গো? তা বল্‌বেই তো মাগী যেন দেমাকে ফেটে রয়েছে—তা নইলে বোন্ অতগুনো ব্যাটছেলের সুমুখে বল্লে কি করে কথাটা;—"

কা। তবু পয়সা হাতে নেই থাকলে বোধ হয় সব চাব্‌কেই না দিতো;—ছি কর মা ছি কর! বড়মান্‌সি দেখে গা জ্বলে যায় মা—

তারার অসহ্য হইল, অথচ ভয়ে সে কোনো কথা বলিতে পারিল না; একটা ছল করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে ভোলানাথ—ভোলানাথ তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গেল। হঠাৎ কাদম্বিনীর চোখ পড়িল সে বাহিরে আসিয়া দেখিল তারা ও ভোলা ধানগোলার পেছনে গেল। কাদু ঘরে ঢুকিয়া জীবনের পরিবারকে ডাকিয়া কাণে কাণে বলিল;—ভট্টাচার্য্য-আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেন কিছু জানে না এই ভাব দেখাইয়া সেইখানে গিয়া

উপস্থিত হইল। তারা তাড়াতাড়ি টাকা কটা কাপড়ে লুকাইল। দুজনে ভারি অপ্রস্তুত হইল। ভোলা চলিয়া গেল। খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে, সে কথা হাজার বার সত্য। জীবন-পত্নী গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিলা তারু? কি হচ্ছিল?" তারা ভয় পাইয়া বলিল "কটা টাকা ধার চেয়েছিনু তাই এনেছিল।" "ওমা টাকা! তা ধার কেনা করে গো? তা অত লুকিয়ে চুরিয়ে যে?" তারা বলিল "পিসি পছন্দ করে না, ধার করি।" "তবু ভাল ভাইঝির রাধুনীগিরিতো পছন্দ করে?" তারা কি বলিবে? সে নিরুত্তর। জীবন-পত্নী কাদুকে ডাকিয়া বলিল "চলো কাদি বেলা হলো।"

তারামণি ও ভোলানাথের এই নিভৃতকথোপকথন কাহিনী নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া জীবন কর্ত্তৃক মহেশের কানে গিয়া পৌছিল। মহেশ দেখিল ভোলানাথের হাত হইতে তারাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে সে ফাঁকে পড়িবে। জীবনকে ডাকিয়া মহেশ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় বসিল। ভবানী প্রসাদের সহানুভূতি থাকাতে তাহা সহজে সিদ্ধ হইবার নহে বুঝিয়া সে অপেক্ষাকৃত যাঁকা পথ ধরিল। জীবন বুঝাইয়া দিল তারামণির অর্থাভাব প্রচুর; ভোলানাথ বা তাহার ভ্রাতৃজায়া সে অভাব যত না মিটাইতে পারিবে মহেশ তদপেক্ষা বেশ পারিবে। কাজেই জীবন বলিল "প্রকাশ্যভাবে ভোলানাথকে বিড়ম্বিত না করিয়া তারামণিকে আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া এমন কি কৌশলে ঋণবদ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে; সম্ভব হয় ভোলানাথকে গ্রামান্তরে বেশী বেতনের চাকরীর লোভ দেখাইয়া পথ হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হইবে না।" মহেশ এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজী হইল। কাদু ঠাকরুণকে তারামণির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার দূতী পদে নিযুক্ত করা হইল। এদিকে স্কুলের হেডমাষ্টারকে বিরলে ডাকাইয়া ভোলানাথের বিরুদ্ধে ছলছুতা ধরিয়া রিপোর্ট করিবার ভার দেওয়া হইল। ভোলানাথের চরিত্র যে সন্দেহযুক্ত এই কথা ইঙ্গিতে হেডমাষ্টারকে জানানো হইল। হেডমাষ্টার মহাশয় বহুদিন হইতে বেতনবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন; এতদিন সুবিধা করিতে পারে নাই; এখন তাহার মাথায় কার্য্য-সিদ্ধির উপায় যোগাইল। তিনি বুঝিলেন সেক্রেটারী বাবুর মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে তাঁহার স্বার্থ সাধন সহজসাধ্য হইবে।

হেডমাষ্টার দিন বিলম্ব না করিয়া ভোলানাথকে নজরে নজরে রাখিতে লাগিলেন; প্রত্যহই একটা ছল ছুতা করিয়া অপদস্থ করিতে ছাড়িলেন না;

মাঝে মাঝে ভয়ও দেখাইতে লাগিলেন "আপনার কাজকর্ম্মে বড় শৈথিল্য ছাখছি যদি অ্যামনে চলেন, তা হলে রিপোর্ট করতি ছাড়মুনা বুঝ্যা চলবেন—।" হঠাৎ একদিন আধঘণ্টা লেট হওয়ার জন্য ভোলানাথ সস্পেণ্ড হইল। ভোলানাথের বুঝিতে বাকী রহিলনা, হঠাৎ এমনটী কেন হইতেছে।

সেদিন ভোলানাথ বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া কথা কহিলনা। যজ্ঞেশ্বরী ব্যাপার কি হইয়াছে জানিবার জন্য ভোলানাথের কাছে যাইলেন

স্ত্রীর উপর রাগ এই :জন্য যে যজ্ঞেশ্বরীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করার সে আদপে পক্ষপাতিনী নয়। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন যে ঝিকেমেরে বৌকে জব্দ করার পলিসিতে এই রাগ। যজ্ঞেশ্বরী ভোলানাথকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। ভোলানাথ বলিতে বসিল।

ফলে তুচ্ছ একটা কথা লইয়া সে দিন দেবর ভাজে খুব একচোট একটা কলহ হইয়া গেল ; ভোলানাথ রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিন আর বাড়ী ঢুকিলই না ; যজ্ঞেশ্বরী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। সৌদামিনী মুখ ভার ও মন আঁধার করিয়া দাওয়াতে বসিয়া রহিল। কিরণের দেখিয়া শুনিয়া অসহ্য হইল ; সে খুব রাগ করিয়াই মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে বসিল। বলিল—"এতেও তো মা তোমার লজ্জা হচ্চেনা তবু থাকতে হবে এখানে ?"

য। বলি যাব কোন চুলোয় বল ?

কি। কেন মামার বাড়ী চল ?

য। কি দায় দুঃখে ভাই ভাজের ভাত মাগ্‌তে যাব শুনি ?

কি। এমনি করে কি এখানে থাকতে হবে ? ভাতই বা মাগ্‌তে যাবে কেন ? দু দশ দিন নিদেন না হয় মাস খানেক থাকলে ? তার পর দাদা গুছিয়ে উঠ্‌লে না হয় বাসা করবো সব ?

য। বাসা করে আলাদা থাকা তো ? তা এখানেও তো হতে পারে ? এ বাড়ীতে কি আমার অংশ নেই ? স্বামী শ্বশুরের ভিটে থাকতে পরঘরি কেন হতে যাব শুনি ?

কি। তাই না হয় করো ? তোমার অসহ্য না হয় কাকারতো হয়েছে ? এখনো বুঝতে পার না যে তুমি এখানে থাকাতেই ওঁর এত—

য। তুই থাম্। একসঙ্গে থাকলে ঝগড়াঝাটী হয় না ? তোদের সঙ্গেই কি

কখনো কথা কাটাকাটি কি মনান্তর হবে না ? একদিন আধদিন একটু ঝগড়া হলে ঘর ছেড়ে পর হতে হবে ?

কি। এক আধ দিনতো নয়, এ যে নিত্যিকাণ্ড হয়ে পড়েছে ? তোমাকে উনি চান্ না তুমি গায়ে পড়ে থাকবে নাকি ?

য। হ্যাঁ থাকি যদি ? অপমান টা কিসে ? আপনার লোকতো ? এতো পরের গায়ে পড়ে থাকচিনি।

কি। আপনার যে এসব জায়গায় পরের বাড়ী হয়ে পড়ছে !

য। তাই বলুক না খুলে যে এক অন্নে থাকা হবে না আমি খুসী হয়ে আলাদা হেঁসেল করছি,, হাঁড়িই না হয় আলাদা হলো তাতে ওরা আমার পর হবে না তা ছাড়া তোর কাকা আমায় না চাইতে পারে সদুকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও সোয়াস্তি পাব না।

কি। কাকাই যদি অশান্তি ভোগ করেন তা হলে কাকীমা কি তোমার জন্যে তাঁর অশান্তি বাড়াবেন ? মোটকথা তোমার এখানে আর থাকা ভাল হচ্চে না।

য। খুব হচ্চে যা তুই, আমায় আর জ্বালাস্‌নি সব—

কি। আমরা জ্বালাচ্ছি না তুমিই সবাইকে জ্বালাচ্ছ ?

য। কিরণ তোদের কি তাই ই ধারণা ? (যজ্ঞেশ্বরী কাঁদিলেন)

কি। (লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়া) না মাপ কর। বড্ড দুঃখে এই কথা বলছি আমাদের নয় তবে কাকার সংসারকে বটে ।

য। এখনি তোরা দু সংসার আলাদা ভাবছিস্ কিরণ আমি যে তা পারিনি, পারবোও না—তোরা না হয় মামার বাড়ী গিয়ে থাক্।

কি। আর তুমি এইখেনে থাক্, কেমন ? মা কি আমাদের এমনিই ভাবো ? হ্যাঁ মা।

য। না তা নয়, তা নয় তোরা কেন অশান্তি পাস্ !

সদু সব শুনিতেছিল উঠিয়া আসিয়া কিরণকে বলিল—"কিরণ কেন দিদিকে চোখের জল ফেলাস্। যে অশান্তি সংসারে দেখা দিয়েছে তা যে আরো ওই পাপে আগুণ হয়ে উঠবে। দিদি মাপ কর তাকে তুমি না মাপ করলে—"

য। আচ্ছা পাগলতো সদু তুই ? আমি কি শাপ শলুই দিচ্ছি যে মাপ চাইছিস্—? বলি তুইতো দেখছিস্ সব কেন এমন হচ্চে বল দেখি ? আমি কতটা দোষী তাই যে বুঝতে পারছি নি ।

সহু। এক বিন্দু না দিদি এক বিন্দু না! তোমাকে ঠিক মত চিন্‌তে পেরেছি আর পারছি এইটেই আমার বড় সান্ত্বনা আমি জানিনি কি বল্‌বো, কি করবো! তবে একটা কথা দিদি তুমি কোনো কথায় থেক না; কোনো কথাটীতে নয় হাঁ না ভাল মন্দ কিচ্ছু না—রোগ যে ওর কোথা আমি তাও বুঝতে পারিনি কি বোঝাব? কি পন্থা দেখবো আমার যে মাথান্তর হয়েছে দিদি। মনে হচ্চে দুমাস পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ী বসে থাকি!

য। তুই কেন ঘর দোর ছেড়ে পালাবি বোন্? আচ্ছা সহু একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি, মাথা খাস্ আমায় সত্যি বলবি; ঠাকুরপোর কি সত্যিই আন্তরিক ইচ্ছে আমি এখান হতে চলে যাই—? বা ভিন্ন হয়ে থাকি? আর কেনই বা এ ইচ্ছে?

সহু। ভগবান জানেন কেন এ ইচ্ছে তবে কথায় বোধ হয়; আমার দোষ নিওনি দিদি আমি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সুখী হবো তা নয়—

য। না লো না তা ভাববনা আমি কি তোকে চিনিনি তুই স্বচ্ছন্দে বল্ কি ওর মনের কথা—

সহু কাঁদন্ মাদন্ হইয়া বড় যা এর হাতদুটী ধরিয়া বলিল—'ওরা ওঁকে শিখিয়েছে যে তুমি ভাজের সঙ্গে একান্ন থাকলে গাঁয়ে ওঁর তিষ্ঠানো ভার হবে বাউনদের যে সে দিন অমন করে অপমান করতে পারে—তার সঙ্গে যার কোনো সংস্পর্শ থাকবে সেই ওদের শত্রু; দেখলেতো সে দিন স্কুলের হেড-মাষ্টার কিরকমেই না, ওঁর পেছনে লেগেছে—বলছিল কাল, চাকরী বুঝি থাকে না—"

য। চাকরী বিনি দোষে মারলেই হলো?

স। যাদের হাতে চাকরী তারা মাল্লে রাখেইবা কে দিদি? আর দেখছইতো ওর তেমন সাহস বা জোর আছে যে নড়বে?

যজ্ঞেশ্বরী অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন; ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা সহু! আমার অন্তত কিছুদিনের জন্য আলাদা হয়ে থাকা বা স্থানান্তরে যাওয়াই ভাল; সত্যিইতো কেন আমি ওকে আমার বিপদের জালে জড়াই? ওরা আমাকে জব্দ করবার জন্য নানান্ রকমে বিরম্বনা ঘটাবে আমি সে সব হীনতা স্বীকারও করতে পারবো না আর ঠাকুরপোকেও তাতে রাজি করতে পারবো না। কেন তবে মিছি মিছি ওর সুখের ঘর ভাঙ্গি। সুখের ঘর

গড়তে এসে যে এমনি করে ভেঙ্গে বস্‌বো সে ভাল নয়—সেই ভাল আমি এই ভিটে ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে থাকি তবে গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবো না যাবও না সহু; তোকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি যমালয়েও গিয়ে সুখী হবো না। আমার দেহ মন যেমনি তোদের আছে তেমনি থাকবে—

সহু। কেন দিদি ভিটে ছাড়বে কেন? এ ভিটে কি আমার একলার? শ্বশুরের ভিটেতে তোমারও অধিকার কম কিসে? বরং বেশী বড়ঠাকুরের টাকাতেই তো এ ভিটে?

য। সে জানি সহু আমি যদি সত্যিই মনে জানে তোদের ওপর শত্রুতা করে ভিন্ন হতাম তা হলে ভিটে ছাড়তাম না তবে কি না ঠাকুরপোর ধারণা আমা হতে দূরে থাকলে সে সংকট থেকে উদ্ধার পাবে তাই এই মতলব, দুদিন তাই থাকি সহু। পালডাঙ্গাতে একটা ঘর তুলে না হয় কিছুদিন থাকিগে?

স। তাই কি হয় দিদি। আবার খরচ করে আলাদা ঘর তুলতে যাবে কেন? সে কেমন ধারা হবে?

য। গোটাদুই কুটুরী! আছে আমার একটা মতলব—পরে জান্‌বি; এই ভিটেতেই আমাকে ফিরে আস্‌তেই হবে দেখে নিস্ সহু এ আমার বিশ্বাস আর মন নিচ্ছে যে আবার আমাদের এক সঙ্গে মিশতেই হবে আর বেশী দিন দেরিতেও না যেমন ছিনু তেমনিই থাকবো। এখন ঘর ভাঙ্গচে বটে কিন্তু এ ভাঙ্গা জুড়বেই জুড়বে একদিন ঠাকুরপো তার ভুল বুঝে বৌদিকে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে—যখন চিড় ধরেছে তখন জোর করে তাকে চেপে ধরে জুড়তে যাওয়া ভুল; তাতে ফল উল্টাই হবে; এই যে ভুল বোঝা বুঝি আমাদের দেওর ভাজে এর একটা শেষ আছেই সহু; ভুলটাই সংসারে সবচেয়ে বড় নয় ঘুমের ঘোরে চোখের ঝাপসার মত ক্ষনিক; কেটে গেলে চোখ পরিষ্কার হবে সত্যি যা তাই বড় হয়ে ফুটে উঠবে—

সহু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার স্বামীর মত আমিও দুর্ব্বল আর ভীতু, কিন্তু দিদি আমি তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পরম সাহস ভরসা পেয়েছিলুম; কিন্তু যার সঙ্গে আমার ভাগ্য বাঁধা সে যদি সে-সাহস, সে-ভরসা না পায় আমাকে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গেই চল্‌তে হবে—আমার দোষ নিওনি দিদি।" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া সহুকে বুকে টানিয়া তার মাথায় চুম্বন করিয়া বলিল—"পাগল হলি সহু আমি তোকে বুঝিনি? এত

কথা তোকে বল্‌তে হবে কেন? যাতে তোরা নিরাপদ হোস্ আমি তাই-ই কর্‌ছি আমার মনপ্রাণ ভালবাসা তার কি একবিন্দু হতে তোরা বঞ্চিত হবি? কোলের ছেলেটী বেঁচে থাক্‌লে আজ গোবুর মত বড় হতো? গোবু আজ আমার সেই শূন্যস্থান দখল করে বসেছে; তাকে ফেলে যেতে পারি আর আমার একবিন্দু শক্তি নেই সহু! ওই আর একটা পরের ছেলেকে কিরণ আপনার করে বসে আছে—ওই বা যাবে কোথা?"

এমন সময় "জ্যাঠাইমা তুমি কি আজ আমাকে খেতে দেবে না" বলিতে বলিতে গোবরধন বাড়ীতে ঢুকিয়া ক্ষুধার শানে গলার সুর কত ধারালো হইতে পারে তাহার পরিচয় দিল। কাছে আসিয়া কোলের উপর ধুপ করিয়া পড়িয়া বলিল "কি যে তোমরা কেবল কেবল কাঁদছ তা জানিনি খে-তে-দে-বে—কি না—বল—জ্যাঠাইমা—?" জ্যাঠাইমা গোবরকে বুকে চাপিয়া চুম্বনে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া বলিলেন—"চলো বাবা চলো—বাবা নয়তো সব শত্রু!—কেন এমন করে আমায় বাঁধলি বল্‌তো?" "বা রে বা কই বাঁধলুম? হ্যাঁ মা জ্যাঠাইমাকে আমি বেঁধেছি?" সহু আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে গেল। গোবর অবাক হইয়া জ্যাঠাইকে বলিল "হ্যাঁ জেঠিমা মা কাঁদছে কেন?" জ্যেঠিমা বলিলেন "আমি মেরেছি।" গোবর হাসিয়া বলিল—"ঘাঃ তুমি মেরেছ! তাই বুঝি হয়!'

য। (হাসিয়া বলিলেন) হয় না? মার্‌তে পারিনি?

গো। কখ্‌খনো না—

য। তবে কাঁদছে কেন?

গো। (চুপি চুপি) বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—

কিরণ। কি ঝগড়া গোবু?

গো বাবা মাকে মামার বাড়ী যেতে বল্‌ছিল তা মা যাবে না তাই বাবা মাকে বকেছে—

য। চল্ ভাত দিগে খিদে পেয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরীর কত কি ভাবনা হইল। দেখিলেন স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছে। তাঁহার মত স্থির করিতে আর বিলম্ব হইল না। সহু গোবরকে ডাকিলেন "ভাত খাবি আয়।" গোবর ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িল। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন "যা বা ভাত খেগে যা মা ডাক্‌ছে—।" গোবর চলিয়া গেলে যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন, "কিরণ বিজুকে চিঠি লেখ্ এসে আমাদের নিয়ে যাগ

মাস খানেক কাশীপুরে গিয়ে থাকিগে, এর মধ্যে একটা ঘর তুলে এসে ঐ খানেই বাস কর্‌বো।"

কিরণ। ঘর আবার কেন মা? এতেও তো আমাদের ভাগ আছে?

য। ঘর আসলে তোর জন্যে কিরণ—এইতো খান বারো কুটুরী ছেলে-পুলের বিয়ে থা হলে তোর মাথা গোঁজবার স্থান নেই আর আমার ইচ্ছে নয় মা, ভাই ভগরের অন্নদাসী হয়ে বিধবা বোনেরা থাকে—আলাদা থাক্‌বি সদ্ভাবও থাক্‌বে—মা বোনের একমুঠো হবিষ্যি জুটে যাবে—কার মনে কি আছে মা কে জানে? ইহকালের সুখ সাধ তো ঘুচেছে যে কটা দিন থাক্‌বি শান্তিতে থাকিস এই ইচ্ছে আমার—যাগ এসব কথা পরে হবে এখন পত্র লিখগে তোর দাদাকে। পরশুই এসে নিয়ে যায়—দিন ভাল আছে কোনো মতে বিলম্ব করে না যেন লিখিস্—। তিনি উঠিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"লিখিস্ আমরা যে যাবো তা যেন লোক জানাজানি না হয়···ভাইঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন এই বল্‌তে হবে—তা না হলে শত্রুরা খুব নাচবে যে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে।"

* * * *

বিজয় পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইল। মা যে উপস্থিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিতে চায় ইহাতে সে খুসী হইল না মাস খানেক আগে হইলে হইত। মায়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে মাসখানেকের জন্য তাহার পল্লীবাস বন্ধ হইবে, সেই আশঙ্কাতেই সে সুখী হইল না; তাহার তরুণ জীবনাকাশের পূর্ব্বভাল যে সুখ-রবির গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার দর্শনানন্দ হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এই তার ভয়; তবে মা যে আবার গ্রামে ফিরিবেন এবং সেখানেই বাস করিবেন এ আশায় সে আশ্বস্ত থাকিল। ছুটী ছিল না পাইবেও না; অথচ মাতৃআজ্ঞা পরশুই তাহাদের আনিতে হইবে। বিজয় সমস্যায় পড়িল; তারপর ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিয়া পঞ্চুকে পত্র দ্বারা এই কার্য্যটী সমাধা করিবার অনুরোধ করিল। কিন্তু চলিয়া আসার যে কারণ, পঞ্চুকে তাহা জানাইল না—পত্রে লিখিল মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে আনা। মাকেও সেই ব্যবস্থার সংবাদ দিল। পঞ্চু পত্র পড়িয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইল; যে কিশোরীটীর···লজ্জামুগ্ধ···মুখের অরুণিমা ও চোখের স্নিগ্ধ কটাক্ষ···প্রথম দরশনেই তাহার হৃদয়বীণার গোপন তারে এমন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন রাগিণী তুলিয়া দিয়াছে যে রাগিণীর অনাহত ধ্বনি

তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বের নূতনতর ও গভীরতর অর্থ শুনাইয়া দিয়াছে তাহাকে আর যে নবলব্ধ বন্ধুটির স্বভাব-মাধুর্য্য ও সঙ্গসাহচর্য্য তাহার পল্লী-জীবনের তিক্ততা নষ্ট করিয়াছিল তাহাকেও কিছুদিন দেখিতে পাইবে না। কিন্তু উপায় কি? বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা অপ্রিয় কার্য্য হইলেও করিতে হইবে। তবে জোর মাস খানেক এই বিরহভোগ এই যা সান্ত্বনা। পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে গিয়া বিজয়ের পত্রসংবাদ দিল। যজ্ঞেশ্বরীও খবর পাইয়াছিলেন।

যথাদিনে পঞ্চু উহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় রাখিতে গেল। তর্ক-সিদ্ধান্তের বাড়ীর নিকট আসিয়া পাল্কী থামাইয়া যজ্ঞেশ্বরী নামিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে গোপনে জানাইলেন, সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিলেন "এই মতলবই ভাল, তবে ফিরে এস মা—জন্মস্থানে হাজার দোষে দোষী হলেও তোমাদের মত লোকের সংস্পর্শ হতে বঞ্চিত হলে আর তার কোনো কালে সদ্গতি হবে না। শুধু সেই জন্যেই মা এত লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেও মাটী আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি।" যজ্ঞেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করিলেন ফিরিয়া আসিবেন। কন্যাদের সহিত পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহারা পাল্কীতে চাপিলেন।

গ্রামের লোকে জানিলেন যজ্ঞেশ্বরী ভাইঝির বিবাহে কলিকাতা গেলেন। সদুও আসল মতলব চাপিয়া গেল। মনে যার পর নাই ব্যথা পাইয়া সে শুইয়া রহিল। সেদিন ভোলানাথ কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে পড়িয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল; সদু প্রথমে উত্তর না দিয়া পরে বলিল—"ভালইতো হয়েছে, কদিন হতে তুমি তো চাইছই তাই!" ভোলানাথ বিরক্তভাবে বলিল "ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা কেহ জিজ্ঞাসা করছে না—তবে এমন করে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" সদু বলিল, "বেশতো এইবার সম্ভব হবে।" ভোলানাথ উত্তর করিল —"তোমার যদি এতই দরদ হয়েছিল তুমিও গেলে পারতে—।" "পারলে কি বল্‌তে হতো তোমায়? তুমি নিশ্চিন্ত হলে, কিন্তু আমি জান্‌লুম যে ঘরের লক্ষ্মী হারালুম—এইটে জেন যে সব যায়গায় স্ত্রীলোকেই ঘর ভাঙ্গে না, স্বামীকে ভাই ভাজ থেকে ভেন্ন করে না; এটা তোমার মত পুরুষেরই দ্বারা হয়ে থাকে। উপলক্ষ হয় শুধু আমার মত হতভাগীরা।" এই বলিয়া সৌদামিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ মর্ম্মে মর্ম্মে নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জিত হইলেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া স্বস্তিবোধ করিল। (ক্রমশঃ)

উদ্বোধন

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

আয়রে বাঁধন-কাটা রঙিন্ নবীন সাধক দল,
মায়ের বুকের কলজে-ছেড়া যে গান আজি উঠেছে বেজে
তোরা শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি তোরা চল।
মেঘ-ছুটা আজ উষার গগন দেখ্‌না চেয়ে ওরে,
অঙ্গনে যে ফাগ লেগেছে, শিশিরবুকে জাগছে তৃণ ভোরে,
ওরে টুটা আগল দোরে।
বিহগ-কুলায় নূতন গীতি,
ভয় ভেঙ্গেছে মায়ের প্রীতি;
আজ মিলেছে খোঁজা বীথি,—
মায়ের ছেলে মায়ের বুকে আয়গো।
রঙ চঙে ও কথার মোহে ভুলিস্‌নেরে তোরা,
আপন গেহে উজল-স্নেহে বাঁধরে বুকে বল॥
মিলন যাদের নাইকো ঘরে বিশ্বপ্রেমে মাতলে হাসি পায়,
কাঙাল যারা আপন দোরে পরের দেশের আন্‌বে অতিথ হায়!
হেলা-ঠেলা পল্লী তোদের ডাকছে—'ওরে আয়';
শিল্প তোদের মরে আছে জাগিয়ে দেরে তাই।
ফিরে পা'বি লুপ্ত তোদের তপোবনের ঋদ্ধি হ'তে
ফোটা মহান্ ফল।
তোরা শুনিসনেরে ছল!!
ভুমার লাগি ভুখা হৃদয় যার,
দলন-নীতি কর্‌বে কি ভাই, তার?
গোপন কারায় আজ লেগেছে আলো,
অমারাতি করবে কি আর কালো?
মরার মত মরতে হ'লে বাঁচার মত বাঁচতে হবেগো,
মামুলীও মনভুলানো 'বিশ্বপ্রেমে' বাদ পরে কি
তোদের আঙিন-তল?
ও সব জ্ঞানের ঝলমল,
ওরে নবীন সাধক দল!

ভুলভাঙ্গা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

১

'বাবা মা মত দিয়েছেন বল্‌চো, তবে আমার মতের দরকার ?'

'রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, একবার শুধু হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও!'

'যাও—যাও, পুরানো অভিনয় রেখে দাও, পথ ছাড়ো—কাজ আছে, ভালো বিপদ সকালবেলা!'

'ওঃ! আমি তা হলে তোমার একটা বিপদ! এতদিন তা বুঝিনি, তা বিপদ নিয়ে ঘর করবার দরকার কি? বালাই একেবারে দূর করে দিয়ে একজন সম্পৎ নিয়ে এলেই চুকে যায়!'

'আচ্ছা কে তোমায় সকালবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ডেকেছিল বল দেখি? আমি কি তোমায় কোনো কথা বলেছি? তুমি যাবে বাপের বাড়ী—জরুরী তাগাদা, বোনের বিয়ে—আমি কোনো কথা বলতে যাবো কেন? আমি বল্‌লেই বা তা শুনবে কে?'

'শোনো লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা। একটী মাত্র বোন, তার বিয়েতে আমোদ আহ্লাদ করতে নিয়ে যাচ্চে, যাবোনা তা হলে?'

'তোমার সখের প্রাণ—আমার কোন কথাই আর তোমার শুন্‌তে হবে না।'—এই বলিয়া সবেগে নরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। অনিলা ছুটিয়া জানালার কাছে লুকাইয়া কাঁদিতে বসিল।

বিপুল অশ্রুধারায় তার ঠোঁটের অলক্তরাগ উঠিয়া গেল, মাদ্রাজী শাড়ী ভিজিয়া গেল, সে একবার মনে করিল যে তার কাকাবাবুকে ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো, আবার কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গেল।

শাশুড়ী পুত্রবধূকে তার কাকার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও নরেন্দ্রনাথের দেখা মিলিল না।

নরেন্দ্রনাথ একেবারে আফিস যাইবার সময় মাতা মহামায়ার কাছে আসিল। মহামায়া রান্নাঘরে ডাল সিদ্ধ করিতে গিয়া নামাবলী গায়ে আহ্নিক করিতেছিলেন। কর্ত্তার তখনও স্নানাহার হয় নাই, তিনি বাড়ীর ভিতরে

একটুকরা জমিতে কত আলু ফলাইতে পারা যায়, তাহা লইয়া বিশ্বম্ভর মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনা করিতে ছিলেন। বামাচরণ বাবু সদাশয় মানুষ,—সকলে তাহাকে কৃপণ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রাণপণে সকলের উপকারই করিতেন।

'মা, বাবা আজ কাছারী যাবেন না?'

'হাঁ, বাবা, যাবেন বৈকি। তোর খাবার সময় হলো, তুই খাবি কখন, নরেন?'

'এই যে মা, দাও দুটী খেয়ে নিই। পাপ বিদেয় হয়েছে ত?'

'ষাট—ষাট! অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে! সিথের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। আমার যত চুল—

'আচ্ছা, এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি? একেবারে সেখানেই আড্ডা নিলে হয়। দেখচো মা, বাবার কাণ্ড! ঐ একরত্তি জমি, ঐখানে উনি হাজার মণ আলু ফলাবেন! আচ্ছা এত টাকা খাবে কে?''

এক পুত্র কিনা—তাই নরেন্দ্রনাথের এত আদর। বামাচরণ বাবু তিনটী কন্যাই বহুদিন পূর্ব্বে সুপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন। পিতাপুত্র দুইজনেই বেশ উপায় করেন। তিন বৎসর হইল, নরেন্দ্রনাথের এক ধনীগৃহে বিবাহ হইয়াছে। বড়লোকের মেয়ে অনিলা, দেখিতে একেবারে দেবকন্যা, অথচ একটুও গর্ব্ব নাই। সকলেই তার রূপগুণের সুখ্যাতি করে। কিন্তু এই তিনবৎসরে হয়ত মাত্র তিনবার নরেন্দ্রনাথ অনিলাদের বাড়ী গিয়াছে। তাহাও শ্বশুর সঙ্গে করিয়া লইতে না আসিলে যায় নাই। তাহার মত, যার যেমন অবস্থা তার সেই রকম থাকাই ভালো। এম, এ, বি, এল, পাশ করিলেও ধনী সেশন্‌স্ জজ্ শ্বশুরের উমেদারী ও সুপারিশে সে মুন্‌সেফী-পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়বাজারে দালালী করিতেছে। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া অনিলা মনে মনে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিত। সেইজন্য সে সহজে বাপের বাড়ী যাইবার নামও মুখে আনিতনা। কিন্তু পরশু যে ছোট বোন প্রমীলার বিবাহ—সে বিবাহে না গেলে লোকে কি বলিবে?

২

সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া নরেন অন্যদিনের মত আর বেড়াইতে গেল না। শয়নগৃহের টেবিলে একখানা সদ্য প্রকাশিত ফরাসী নভেল লইয়া পড়িতে বসিল। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, কলিকাতা সহরের বায়ুমণ্ডলটা একটা ঘন

ধূমের আবরণে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। নরেন ক্রমশঃ চিন্তার ভারে এতই অবসন্ন বোধ করিতেছিল যে সহরের অনন্ত কোলাহল, ট্রামের শব্দ, ফিরিওলাগণের গুতরব, মোটরের হৃদয়বিদারী গর্জ্জন—তাহার চিন্তার সমুদ্রে সব ডুবিয়া গেল। সে দেখিল টেবিলে দুটো মাথার কাঁটা পড়িয়া আছে। তাহা একবার চকিতে নাসিকাগ্রে ধরিল, ক্রমে তাহার মনটা আবেশে বিভোর হইয়া উঠিল, সে গত রজনীর ব্যবহৃত শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া একেবারে শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল। ঐখানে তাহার ট্রাঙ্ক ছিল, এখন সেখানটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা, ঐখানে তাহার নীলাম্বরী, খড়কে-পাতা শাড়ী, সেমিজ ও ব্লাউজ থাকিত; সন্ধ্যার সময় শঙ্খধ্বনি করিয়া আসিয়া ঐখানে তাহাকে কত নমস্কার করিত; আর ঐ চেয়ারের পার্শ্বে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কতবার আসিয়া সে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গিয়াছে। সমস্ত কক্ষটী অনিলার মধুর স্মৃতিগন্ধে ভরপুর হইয়া আছে। কিন্তু আজ সে কোথায়? যে এত ভালবাসার নিদর্শন দিয়া গিয়াছে, সে কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? কেন, কাল যাইলে কি চলিতনা? যাহাকে অত সুন্দর দেখিতে, তার কি পাষাণ দিয়ে গড়া হৃদয়! এদিকে তাহার একদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইলে অনিলার ক্রোধের সীমা থাকিত না। আর আজ সে তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া গেল? যাইবার সময় চোখ দুটী কি একবার ছলছলও করিল না? অথচ এদিকে সে কাজের দায়ে কতবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে, আর প্রতিবারই অনিলা কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। এ সবের অর্থ নরেন্দ্রনাথ মোটেই বুঝিলনা। সে ভাবিল, নারী মাত্রেই স্বার্থপর, বিলাসের দাসী। যেখানেই অসার ও ক্ষণিক আনন্দ, সেইখানে নারীই অগ্রণী। ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে নাই। ও-সব কবির কল্পনা। আবার ভাবিল এত কষ্টইবা কিসের জন্য? যে তাহাকে চায় না, সে-ই বা কেন তাহার জন্যভাবিয়া মরিবে? যাক্, আর সে অনিলার কথা ভাবিবে না, অনিলা বলিয়া এ জগতে কেহ ছিল না।

৩

নরেন্দ্রনাথের শ্যালক আসিয়া বিবাহ বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গেল। সে নানারকম ওজর আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৃদ্ধ বামাচরণের আদেশ হইলে আর সে দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না।

সে রাত্রে বিবাহ-সভা গুলজার। নূতন বর একে জমীদারের পুত্র দেখিতে তাহারচেয়েও সুন্দর। বিবাহ-সভায় সকলেই ব্যস্ত। সকলে তাহাকে

অন্দরে পাঠাইয়া দিল। তখন নূতন জামাতার বরণ হইতেছে। অনেক সুন্দরীর-সমাবেশ হইয়াছে। এসেন্সের ও ফুলের নিবিড় গন্ধে সেই বিদ্যুদালোকিত প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গনটী ইন্দ্রপুরীর মত হইয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে সে বরণ দেখিতেছিল। ভয়ত্রস্তা বধূবেশা প্রমীলা বরের সম্মুখে গোলাপী চেলী পরিয়া অবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আর চারিদিকেই তরুণীদের কোলাহল ও জনতা,—যেন কি-একটা অনেক কালের হারানো দুর্লভ জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, এমনি ভাব। নরেনের চক্ষুও সেই ভিড়ের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। ঐ যে খয়ের রংএর সিল্ক সাড়ীপরা হাস্যমুখরা চঞ্চল মেয়েটী! বরের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছে।—ঐ যে সপ্রতিভ বর মহাশয়ও কি-একটা বেশ জবাব দিলেন—সকলে খুব হাসিয়া উঠিল, শুধু ওই মেয়েটীই যেন লজ্জায় ভিড়ের ভিতর সরিয়া গেল। ঐ যে ঐ যে! নরেন্দ্র সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

সে বেশ বুঝিল, নূতনের আগমনে পুরাতনের অমর্য্যাদা অবশ্যম্ভাবী। তাহার বিদ্যা ও চরিত্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ত এই বরের মত রূপের ও টাকার ঝলক্ নাই। বর ইন্দুপ্রকাশ তাহার মত রসবর্জ্জিত অকবি নয়,—কেমন চুলের পারিপাট্য, বেশের অভিনবলীলা, কেমন কবিত্বময় ভাবভঙ্গী। সকলেই ইন্দুপ্রকাশের সারল্য ও রূপের প্রশংসা করিতেছে। শেষে অনিলাও তাহা দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল! এতদূর নরেন্দ্রনাথ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

নরেনের শ্বাশুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া আহারাদি করাইলেন। তারপর বাসরঘরের পালা। গৃহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ঘরে খুব পুরু কারপেট বিস্তৃত একপ্রান্তে সুসজ্জিত, মাল্যদামবেষ্টিত, আলোকমালা মণ্ডিত 'থোণে' বর ও কনে, আর তৎসমক্ষে নানাবয়সের নারী একটা প্রকাণ্ড হারমোনিয়ম লইয়া বসিয়াছে। নরেন পার্শ্বের কক্ষ হইতে সব শুনিতেছিল।

'হাঁ বর তোমার শালী কোন্‌টী জানো ত?'

'খুব জেনেছি—যে গাল টিপে ধরেছিলেন! দিদি, শুনুন, এখন পালিয়ে গেলে চলবে না, এখন আমার ব্যথা সারিয়ে দিয়ে যান।'

অনিলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই বর, আমাকে আর সারাতে হবে না, গালের অসুখ গালেই সারে—ঐ যে তোমার বাম পাশেই ঔষধ!"

প্রমীলা গুণ্ঠনের আড়াল হইতে অনিলাকে মস্ত বড় একটা কিল দেখাইল।

লাবণ্য বলিল, 'ভাই বর, একটা গান শোনাও!'

চারু বলিল, 'হাঁ ভাই, তোমার কথাই যখন এত মিষ্টি, না জানি গান আরও কত মিষ্টি!'

বৃদ্ধা ঠানদিদি বলিলেন, হাঁ দাদা, আগে তুমিই আরম্ভ করো, নইলে বাসর জমবে না।

ইন্দু বেশ ছেলে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে হারমোনিয়ম কোলে তুলিয়া প্রমীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া গাহিল—

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি!
তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনি!' ইত্যাদি।

গানের সুরলহরী সেই গন্ধাকুল কক্ষে ভাবের তুফান তুলিল। বয়োবৃদ্ধারা তেমন তারিফ্ না করিলেও অনিলা শতমুখে ইন্দুর সঙ্গীতনৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। বেচারা প্রমীলা মাধবীরাতের মোহমুগ্ধার মতই সে ইঙ্গিতে ধরা পড়িয়া গেল—একবারে চিরজীবনের মত। তারপর ইন্দু অন্য সকলকে গাহিতে বলিল।

'আচ্ছা, তুই না বরের শালী, তুই গাইবিনা ত গাইবে কে?'

'না, দিদি, আমি গান জানি না, আমায় মাপ করো।' তার মনে হইতেছিল—নরেন্দ্রনাথের সেই গম্ভীর আদেশ।

সুহাসিনী বলিল, 'না তোকে গাইতেই হবে, ইন্দু একবার বলতেই কথা রাখলে আর তুই যে একেবারে নাছোড়বান্দা!'

ইন্দু বলিল, 'হাঁ, এখানে গাইতে আর আপত্তি কি, এখানে ত আর আপনার ভয় করবার কেউ নেই!'

নরেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। সে শাশুড়ীর নিকট অসুস্থতার ছল করিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে।

অনিলা ভাবিতে লাগিল—বাস্তবিক কি গান গাহিবে সে!

'আচ্ছা, আমি গানই জানি না—কি গান গাইবো!'

ইন্দু ধরিয়া বসিল, 'না, সে কথা শুনচিনি, শিকারী বেরালের গোঁপ দেখলেই চেনা যায়। তাই নরেন বাবু আপনাকে ছাড়তে চান না, সে খবরটুকু আমি আপনাদের বাড়ী এসেই একটী ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েচি।'

ছিঃ ছিঃ, অনিলার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল।

অশেষ আগ্রহের পর অনিলা গান গাহিতে রাজী হইল। ইন্দু হারমোনিয়মে সুর দিতে লাগিলেন।

প্রথমে চাপা গলায় অনিলা ধরিল—

'হৃদি বাঁধিয়া কেন নয়ন জল
দাওনা সখা মুছিয়া।
'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া
(তুমি যাওনা কেন ভুলিয়া)।
কাতর প্রাণে ব্যাকুল হৃদয়ে
মিছে কেন মর ঘুরিয়া।
তুমি অমন করিয়া মুখেরি পানে
থেকোনা শুধু চাহিয়া
(তুমি থেকোনা সখা চাহিয়া)।'

বড় সুন্দর—বড় সুন্দর! সঙ্গীত ভক্ত ইন্দুও শেষ লাইনের সকরুণ সুরটী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রীত হইল। নরেন ভাবিল—এতদূর? আর এদিকে আমি কতবার পায়ে ধরিয়াছি একটী গান গাহিবার জন্য বেশ, যথেষ্ট হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই পার্শ্বের দ্বার দিয়া নরেন্দ্র বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়াও তাহার গানের এক লাইন মনে পড়িতেছিল—

'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া' ইত্যাদি।

৪

প্রমীলার বিবাহের পর প্রায় কুড়ি দিন কাটিয়া গিয়াছে। অন্যবারে অনিলা বাপের বাড়ী গিয়াই চিঠি দিত, কিন্তু এবার কোনই সাড়াশব্দ নাই। নরেন্দ্র আরও ক্রুদ্ধ হইল। সে ভাবিল, সে অন্ধকারের জীব,—যাহারা আলোকের রাজ্যে বাস করে, তাহাদের কাছে তাহার আঁধার স্মৃতি যে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত। বর্ষার উচ্ছ্বসিত নদী যেমন আপন অন্তঃস্থলে মাটী কাটিয়া চলিয়া যায়, তেমনি অব্যর্থভাবে এই ধারণাটা নরেনের বুক চিরিয়া চিরিয়া গভীর হইয়া রহিল। মহামায়া দেখিলেন, ছেলের আর কোনও বিষয়ে তেমন অনুরক্তি নাই, তাহার মুখে সে দীপ্তিময় হাসিও নাই, সামান্য কথায় আজকাল সে বড়ই রাগিয়া যায়। তাহার শয়নগৃহ হইতে নরেন অনিলার স্মৃতি যথাসম্ভব মুছিয়া

ফেলিয়াছে। আজ সে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। আহারাদির পর তাহার খুব জ্বর আসিল। মহামায়া ও বামচরণ অত্যন্ত ভাবিত হইয়া পরদিনই অনিলাকে আনাইতে পাঠাইলেন।

প্রভাতের অরুণ কিরণ যখন ঘরের ভিতর নির্ম্মল হাস্যের মত প্রবেশ করিয়াছে, তখন যাতনায় অধীর হইয়া নরেন ডাকিল 'মা গো, একটু জল।' দ্বিপ্রহরের জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বিভ্রান্তমনে উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পরই অনিলা আসিল। সে জানেনা যে নরেনের অসুখ করিয়াছে। শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গিয়া নরেনের কক্ষে ব্যাপার দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মহামায়া বলিলেন, 'একটু চুপ করে শোও, বাবা। এই যে অনিলা মা এসেছে। দেখ বাবা।'

নরেন্দ্র প্রলাপের মতই বলিল, 'না, অনিলা, কিছুতেই গান গেয়ো না। ইন্দুকে কি এতই সুন্দর দেখতে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও গান শিখবো এবার থেকে, দেখো—দেখো'।

মহামায়া উঠিয়া গেলেন। অনিলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

অনিলা বেশ বুঝিতে পারিল কিসের জন্য নরেনের এই অসুখ করিয়াছে। সে সহসা উঠিয়া নরেনের পদধূলি লইয়া সেই জ্বরতপ্ত পা দুখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওগো, জন্মে জন্মে যে তোমাকেই চেয়েছি। সে-সব লোক-দেখানো আনন্দ—তাহার ভিতর কি প্রাণ ছিল? তুমি আমার দেবতা হইয়া এ কথা বুঝিলে না? হে মদনগোপাল; এই বুকের রক্তে তোমার চরণযুগল ধুইয়া দিব, আমার স্বামীকে নীরোগ করিয়া দাও, প্রভু!'

মদনগোপাল জীউ অনিলার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সপ্তাহ পরে নরেন্দ্রনাথ পথ্য পাইয়া সুস্থশরীরে সন্ধ্যা বেলায় যখন হাসিতে হাসিতে অনিলার সযত্নরচিত কবরীটি নির্ম্মম ভাবে বিশ্রস্ত করিয়া দিল, তখন অনিলা বলিল, 'এই বুঝি আমার পুরস্কার? না, এটা আমার দোষের শাস্তি?'

'না, না, অনিলা, এটা পুরস্কার, আর এই শাস্তি' বলিয়া অনিলার কম্পমান আরক্তগণ্ডে নরেন্দ্রনাথ সস্নেহে চুম্বন করিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লাহোর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেপরিচিতদের মধ্যে যাঁহাদের সহিত দেখা শুনা করিয়াছিলাম তাঁহাদের একজনের বিষয় এখানে কিছু বলিয়া রাখিতে চাই। ইনি বোধ হয় ঠিক পাঞ্জাবী ছিলেন না। ইহার পূর্ব্ব নিবাস যুক্ত-প্রদেশেরই কোন স্থানে হইবে। তবে এখন পাঞ্জাববাসীই হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার আচার ব্যবহার সব পাঞ্জাবী ধরণেরই হইয়া আসিয়াছিল। নিজের পূর্ব্ব পরিচয় নিজে না প্রকাশ করিলে ইনি যে পাঞ্জাবী নন এইরূপ ভ্রম কাহারও হইবে না। অনেক বাঙ্গালীই বাঙ্গলাদেশের বাহিরে বসবাস করিতে-ছেন, কিন্তু ইহারা নিতান্ত শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলেন না। তিন চার পুরুষ অথবা আরও বেশী দিন বিদেশে বসবাস করিয়াও অধিকাংশ স্থলেই ইহারা ঠিক বাঙ্গালীটিই থাকিয়া যান, বরং সে সকল স্থান বাঙ্গালীদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ বিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা দেখিয়াছি, ঐরূপ অবস্থায় বিদেশে বসবাস করিতে করিতে খুব শীঘ্রই নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া একেবারে সেই সকল দেশের লোক হইয়া পড়েন। যাহা হউক কাশী ফিরিবার পূর্ব্বে ইহার সহিত কথা-বার্ত্তায় ইহার ভিতর একটু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া-ছিলাম। ইনি নানা কথার পর দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে বাঙ্গলাদেশ ঐ সময় তাঁহাদিগকে মোটেই অর্থের সাহায্য করেন নাই যদিও সেই মামলাতেই বসন্তকুমারের জন্য টাকা ও ব্যারিষ্টার প্রেরিত হইয়াছিল; এইরূপ আরও কিছু কিছু অভিযোগ তিনি বাঙ্গলার বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। আমি যদিও সে সময়কার সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে জানিতাম না, কারণ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি ঐ দলে প্রবেশ করি, কিন্তু আমি যাহা জানিতাম সেই অনুযায়ীই বলিলাম যে আমরা দল হইতে কাহাকেও কিছুই সাহায্য করি নাই, এবং টাকা ও ব্যারিষ্টার যে পাঠান হইয়াছিল তাহা বসন্ত বাবুরই কোনও বিশেষ বন্ধু নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ঐরূপ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। পাঞ্জাবের নবীন শিখদলের বিষয় ইহাকে জিজ্ঞাসা করায়, যেন

এবিষয় ইনি কিছু জানেন না এইরূপ ভাবে উত্তর দিলেন, অথচ যাহা বলিলেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে এই দলের বিষয় ইনি নিতান্ত যে কিছু জানেন না তাহা নহে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। অথচ এই দলে তাঁহার নিকট হইতে এসকল বিষয় জানিবার অধিকার আমার ছিল। ইহার বলিবার ধরণে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছিল যে এই শিখদল নিজেদের খেয়ালমত সব কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহারা কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা রাখে না। অর্থাৎ কিনা "বাঙ্গলাদেশ! তুমি আবার কেন ইহার মধ্যে মাথা গুজিতেছ?" রাসবিহারী এ সময় পাঞ্জাবে আসিলে কাজের সুবিধা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন হাঁ তিনি ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম "হাঁ, ইচ্ছা করিলে।" দেখিলাম রাসবিহারীকেও এদিকে আনিবার ইহার বিশেষ আগ্রহ নাই, অথচ ইনি রাসবিহারীর সহিত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। কয়েকজন শিখ দলের নেতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় বলিলেন যে তেমন শিখ নেতাদের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই, অথচ ইতিপূর্ব্বে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে লাহোর হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন। যখন তিনি এইরূপে শিখদলের অনেক কথা আমার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

অহংকে যতই দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি না কেন, অহং ভাব কতরূপেই না আমায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এইরূপে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক ইহার সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, পাঞ্জাবীরা সকলেই এইরূপ ছিলেন। বরং যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন তাঁহারা অন্যদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীকে যেন অধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং আমার মনে হয় অন্যান্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা এমন কি অনেক পাঞ্জাবীর অপেক্ষাও শিখেরা যেন বাঙ্গালীদের প্রতিই একটু অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। আমার বোধ হয় সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে যাঁহারা থাকেন না তাঁহারাই সমালোচক হন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও আমাদের কার্য্যে অনেক সময় অনেকরূপে সাহায্য করিতেন বটে কিন্তু মোটের উপর যেন আমাদের নিকট হইতে একটু দূরেই থাকিতেন। সেইজন্য আমরাও উঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতাম না; তবে এই সময় পাঞ্জাবের ভিতরকার অবস্থা জানিবার জন্য সকলকার

নিকটই যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম! বিপদে পড়িলেও ইনি যে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবেন না এতটা বিশ্বাস ইহার উপর অবশ্যই ছিল এবং সে বিশ্বাস যে ঠিক ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কারণ তিনি বিপদেও পড়িয়াছিলেন যথেষ্ট।

যাহা হউক বিপ্লবায়োজনের এক অভিনব পর্ব্ব আরম্ভ হইল ভাবিয়া কাশী অভিমুখে লোহযানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কেবল থাকিয়া থাকিয়া ইহাই মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে কাশী গিয়া পঁহুছিব, কতক্ষণে রাসুদাকে গিয়া সকল কথা বলিব।

পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া ইহা বুঝিয়াছিলাম যে খুব শীঘ্র এই নবীন শক্তিকে সংহত ও সুসম্বদ্ধ করিতে না পারিলে হয়ত এই শিখেরা অসময়ে একটা এমন কিছু করিয়া বসিতে পারে যাহাতে সকল শক্তি সকল উদ্যম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—তখন কে জানিত যে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও, এত সন্তর্পনে এত সংযতভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াও পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—অবশ্য এজগতে কিছুই ব্যর্থ হয় কিনা সে আলোচনা এখন করিলাম না।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথেই স্থির করিয়াছিলাম যে যত শীঘ্র পারা যায় দাদাকে এদিকে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এবং আমাদের অঞ্চলেও সৈনিক-দিগের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। এতদিন কেন আমরা এই দিকে মন দিই নাই তাহা পরে বলিব। আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম যে দাদাকে এইদিকে পাঠাইয়া আমি বাঙ্গলাদেশে চলিয়া যাইব। বহুদিন হইতেই আমার বাঙ্গলাদেশে গিয়া কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। আমি এবিষয় দাদাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি মোটেই মত দিতেন না।

পাঞ্জাব ছাড়াইয়া যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়াছে; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার কামরাটীতে যাত্রী বড় বেশী কেহ ছিলেন না। বোধ হয় আমরা তিনচারিজন হইব। সে সব দিনে বোধ হয় জগতে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা না হইত। পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় হইতে হইতে ইউরোপের মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিল। আমার একটি সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহাদের গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহ কিরূপ চলিতেছে। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে সেনাদলে লোক সংগ্রহ আজ-কাল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যদিও অনুনয় বিনয় ও

প্রলোভনের অন্ত নাই। প্রথমতঃ মাসিক বেতন খুব উচ্চহারে দেওয়া হইবে এবং একমাসের বেতন অগ্রিম পাইবে এইরূপ বলা হইতেছে। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছেন। যাহারা এইরূপ লোক সংগ্রহ করিয়া দিতেছে তাহাদিগকে খুব উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এত করিয়াও লোক পাওয়া যাইতেছে না? সৈনিক হইবার সামর্থ্য আছে এমন পুরুষেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম তাহা হইলে বোধ হয় লোক সংগ্রহ একেবারেই হইতেছে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, যে নিতান্ত যাহারা একেবারে গর্দ্দভ, প্রলোভনে পড়িয়া প্রথমতঃ তাহারা সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে স্বীকার করিতেছে ও পরে যখন সৈনিকের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তখন তাহারা সৈনিক দল ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারিতেছে না, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেকে পলায়ন তৎপর হইয়া পুনরায় পুলিশের কবলে লাঞ্ছিত হইতেছে।

পাঞ্জাবের অবস্থাও ঠিক এইরূপই শুনিয়াছিলাম, সেখানে নাকি সৈন্য সংগ্রহ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় কিন্তু আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কি রেলে, কি পথে ঘাটে সকলস্থানেই অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে তীব্র ইংরাজবিদ্বেষ যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। একদিন কাশীর একটি প্রান্তর কোনের ইঁদারায় বাঁধান সানের উপর বসিয়া একটি হিন্দু স্থানীর সহিত আমাদেরই কোনও কাজের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। অদূরে একটি চাষী ঘাস কাটিতেছিল। এক সময় দেখি সে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; একটু পরে ঘাস কাটিতে কাটিতে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু! ইংরাজ রাজত্ব থাকিবে কি না?" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি মনে হয়?" সে বলিল "বাবু! এবার ইংরাজ রাজত্ব আর থাকিবে না, ইহাদের সময় হইয়া আসিয়াছে।" "বাবু জার্ম্মানরা কতদিনে আসিবে।" আমরা তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম জার্ম্মানরা আসিলে আমাদের কোনও লাভ নাই; কিন্তু সে পুনরায় বলিল—"না বাবু! ইংরাজেরা আর ন্যায়ধর্ম্ম পালন করছে না, এদের এখন যাওয়াই ভাল"। ইহার পরে আমাদের যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছিলাম, এখন তা না বলিলেও চলিবে। এই সময় দেখিয়াছি বাবুরা ইহাদের কথায় সায় না দিলে বাবুদের উপর ইহারা অসন্তুষ্ট হইত।

পাঞ্জাব মেল কাশীতে বেলা তিনটার সময় আসিয়া পঁহুছায়। আমার

উপর আবার সে সময়ে পুলিশের খরতর দৃষ্টি। ভোর বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত পুলিশ বাড়ির দরজার সম্মুখে অথবা নিকটেই কোথাও বসিয়া থাকিত ও বাড়ির বাহির হইলেই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বাড়ির বাহির না হইলেও আমার সহিত দেখা শুনা কাহারও পক্ষে নিরাপদ ছিল না, কারণ আমার সহিত যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা পুলিশের নজরে পড়িবে তাঁহারই দশা আমার মত হইবে। সেই জন্য সে সময় আমাদের মত লোকের সহিত সহজ সরলভাবে মেলামেশটাও দোষের মধ্যে ছিল। এইরূপ কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়াও আমাদের সকল রকম কাজই করিতে হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে বোমা ও রিভলভার ইত্যাদি কাশী অঞ্চলে আনা আবার এই দিক হইতে এই সব পাঞ্জাবে বিভিন্ন প্রদেশে লইয়া যাওয়া, এ সবই এইরূপ কড়া পাহারা সত্ত্বেও করা হইয়াছে। পুলিশের চোখে ধুলা দেওয়াটা আমরা মোটেই কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম না। কি করিয়া আমরা পুলিশের তীব্র পাহারা ব্যর্থ করিতাম তাহার কতক পরিচয় দিয়া পরে অন্য কথা বলিব।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার আমাদের সর্ব্বপ্রধান কৌশল ছিল প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কোনওরূপে প্রহরীকে ফাঁকি দেওয়া। যদি প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে অকৃতকার্য্য হইলাম ত সেবার দলের কোন কাজ না করিয়া, দলের কাহারও সহিত দেখা না করিয়া সহপাঠীদের কাহারও বাটি চলিয়া যাইতাম অথবা বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়া সংসারের কোন কাজ লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম, বাড়ির লোকে মনে করিত "আজ যে বড় শচী সংসারের কাজে মন দিয়েছে!" আর তা না হইলে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে গিয়া মাসিক পত্র ও খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়িয়া বাড়ী ফিরিতাম। নিতান্ত পক্ষে গ্রীষ্ম কাল হইলে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া মাথায় কিঞ্চিৎ তেল মর্দ্দন করিতে করিতে মা গঙ্গার পুণ্য সলিলে দেহ মন সিক্ত করিয়া সে যাত্রা প্রহরীকে অল্পেই নিষ্কৃতি দিতাম, কারণ কোন কোনও দিন বেচারা আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে নাকাল হইয়া যাইত। এই সকল প্রহরীদের প্রায় কাহারও সহিতই কোনরূপ ব্যক্তিগত বিরোধভাব ছিল না, চোখে চোখ পড়িলেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিতাম। হয়ত তেতালার জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছি প্রহরী ভায়া কোথায় কোন দিকে কি অবস্থায় আছেন,

এমন অবস্থায় প্রহরীও আমায় দেখিতে পাইল, আমি জানালা ভাল করিয়া খুলিয়া দিলাম বন্ধুবর মাথা নীচু করিয়া মন্থর গতিতে স্মিত হাস্যে বাড়ির সম্মুখ দিয়া একদিকে কিছু দূরে চলিয়া গেলেন। এ সব আমরা অধিকাংশ সময় কেবল উপভোগই করিতাম। এই সকল প্রহরীদের ফাঁকি দিতে পারিলেও মহানন্দ হইত আবার ফাঁকি দিতে যাইয়া ধরা পড়িলেও একটা হাস্য কৌতুকেরই সৃষ্টি হইত কিন্তু কখন কখনও এই সব প্রখর দৃষ্টির ফলে কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইলে ইহাদের উপর ভয়ানক রাগ হইত। অনেক সময় ইহাদিগকে আমরা বুঝাইতাম "ভায়া, নিজেদের চাকুরি যে কোনও উপায়ে পার বজায় রাখ, কিন্তু এরূপে সারাদিন বাড়ির সম্মুখে বসিয়া থাকাটা কি ভাল, বাড়ীর লোকে, পাড়াপ্রতিবেশীরাই বা কি মনে করিবে। আর দেখ সরকার বাহাদুর মনে কি করিতেছেন না জানি আমরা কি ভয়ানক কার্য্যই করিতেছি, এটা তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস, যাহা হউক তোমাদের চাকুরী তোমরা অবশ্যই বজায় রাখিবে কিন্তু বৃথা আমাদের এরূপে ক্রমাগত বিরক্ত করিও না।" এই সব গুপ্তচরদিগের অনেকে আবার ভাল মানুষও ছিল, তাহারা আমাদের সহিত এত নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিত যে তাহাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও হিংসাভাব ছিল না বরং তাহাদিগকে দেখিলে কেমন একটু সহানুভূতির ভাবই মনে আসিত। তাহারাও অধিকাংশ সময় নিতান্ত দায় পড়িয়া দিনান্তে অথবা সকাল বিকাল কেবল এইটুকুমাত্র খোঁজ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিত যে আমরা কাশীতেই আছি কি না এবং পরে বাটিরই নিকটবর্ত্তী কোনও গলিতে অথবা বড় রাস্তার কোনও দোকানে বসিয়া অবশিষ্ট সময় হাস্যালাপেই কাটাইয়া দিত। কিন্তু আমাদিগকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলে অনুসরণ করিতেও ছাড়িত না। আবার এক একজন এইরূপ ভাবেই আমাদের পিছনে লাগিত যেন আমরা তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। আমরাও ইহাদিগকে নাকাল করিতে ছাড়িতাম না। হয়ত শুধু শুধুই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, এক গলি হইতে আর এক গলি ঘুরিয়া হঠাৎ খুব জন কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া পাস কাটাইয়া একেবারে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতাম। যদি গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কোনও দারোগা এইরূপে আমাদের অবাধে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেন ত সে দিন যে প্রহরী আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার ভাগ্যে তপ্ত মধুর রসের ব্যবস্থা হইত।

অনবরত এই সকল গুপ্তচরদিগের সহিত লুকোচুরি খেলার ফলে আমাদের

এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে ইহাদিকে দেখিবামাত্র গুপ্তচর বলিয়া অনুভব করিতে পারিতাম। আজত সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ আরও স্পষ্টভাবে আমাদের নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে আমরা পুলিশের কৌশলের নিকট কখনও পরাস্ত হই নাই। কেবল মাত্র আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া পুলিশ একটিও নূতন লোকের পরিচয় পায় নাই। ইহারা যখন চক্ষের মত আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত সেই সময়ই আমরা বোমা ও রিভলভার লইয়া কাশীরই বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসা করিয়াছি আবার এইসব আমরা কাশীর বাহির হইতে আনিয়াছি এবং কাশীর বাহিরেও প্রেরণ করিয়াছি। একদিন সকাল বেলা বাড়া ফিরিতেছিলাম, বাটির সন্নিকটে আসিয়া পড়িত পর একেবারে গুপ্ত পুলিশের দারোগার সম্মুখে, সঙ্গে আবার তাঁহার একটি অনুচর। আমায় দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমও ঠিক তেমনই প্রফুল্ল বদনে তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। "কোথাও গিয়াছিলেন মর্ণিংওয়াক করিতে বুঝি।" আমিও বলিলাম হাঁ একটু বেড়াইয়া আসিলাম। "এটা কি" বলিয়া আমার বুক পকেটের একটি ছোট খাতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ধরিলেন। তৎক্ষণাৎ খাতাটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া দিলাম। খাতায় নেপোলিয়ানের কএকটি উক্তি ও ঐরূপ আরও দুই একজন খ্যাতনামাদিগের জীবনের কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। খাতাটি ভাল করিয়া দেখিয়া আমায় তিনি পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমরা বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলাম। সেই দিন সেই সময় আমার জামার নিম্নের পকেট গানকটন্ ও ঐরূপ আরও অন্যান্য ভীষণ পদার্থে পূর্ণ ছিল।

দূর হইতে দেখিলেই যেন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিতাম যে ইহারা পুলিশের লোক। সাধারণ প্রহরাদের পাহারা দেখিলেই অনেক সময় চিনিতে পারা যাইত। আবার অনেক সময় তাহাদের মাথার টুপি, চলিবার ভঙ্গি ও হাতে ছড়ি ধরিবার ধরণ এমন বিশিষ্ট রকমের ছিল যাহা আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে কখনও আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অথবা কখন কখনও ইহাদিগের সঙ্গীদিগকে দেখিয়া ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইত। রাজপথে চলিবার সময় আমাদের এমন কতকগুলি অভ্যাস হইয়া-গিয়াছিল যাহা জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত দূর হয়

নাই। রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে হয়ত কাহারও সহিত গল্প করিতে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং সেই অবসরে আগে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা। রাস্তার মোড়ে একবার করিয়া পিছনে তাকানর অভ্যাসের ফলে এই সে দিনও অনেকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছি। তাহা না হইলে হয়ত কোন দোকানে কিনিবার অছিলায় অথবা অন্য কোনরূপ বাহানা করিয়া চলিতে চলিতে একবার করিয়া অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া লইয়া রাস্তা চলিতাম না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতাম যে আমাদের এতটুকুও অসাবধনতা হইলে একজনের জন্য দলকে দল হয়ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে না দাঁড়াইয়া পিছন কখনও ফিরিতাম না। যদি একই মুখ কয়েকবার দেখিলাম ত তাহার উপর তখনই সন্দেহ হইয়া যাইত এবং সন্দেহ ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কোনও নির্জ্জন গলিতে ঢুকিয়া পড়িতাম। তখন হয় তিনি ধরা পড়িয়া যাইতেন অথবা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনুসরণ ত্যাগ করিতে হইত। যখন এইরূপে আমাদের অনুসরণকারীকে ধরিয়া ফেলিতাম, তাহাকে কোনও রূপে ফাঁকি দেওয়াই তখন আমাদের প্রথম কাজ হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ফাঁকি দিবার প্রধান অবলম্বন ছিল নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ খুব জনবহুল স্থানে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ফেলা। তাহা ছাড়া প্রথম বাড়ীর বাহির হইবার সময়ই খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতাম এবং বিশেষ কাজের দিন অতি প্রত্যুষে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতাম। যখন বাড়ী ফিরিতাম, দেখিতাম আমার অনুসরণ কার্য্যে নিযুক্ত প্রহরীটী আমি বাড়ীতেই আছি ভাবিয়া বাড়ী আগলাইয়া বসিয়া আছে।

পুলিশের সহিত আমাদের এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় বেলা তিনটার সময় কাশী আসিয়া পঁহুছিলাম। পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া বাড়ী গেলাম আবার বাড়ী হইতে পুনরায় দাদার বাসায় গেলাম। রাসবিহারী সেসময় কাশীতেই ছিলেন। পুলিশ কিন্তু তখনও ঘুণাক্ষরেও আমাদের গতিবিধির বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

দাদার সহিত পরামর্শ ঠিক হইল যে যুক্তপ্রদেশেরও সৈনিকদিগের মধ্যে বিপ্লব প্রচার আরম্ভ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশেও এই সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ৫ই ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ পৃথ্বী সিংএর সহিত দেখা শুনা হইবার পর বাঙ্গলা দেশে যাইব এইরূপ স্থির

হয়। ইতিমধ্যে কাশীর সেনাবারিকে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দুই একদিন যাইতে না যাইতে কাগজে পড়িলাম আমেরিকা প্রত্যাগত কিছু শিখ একটী গ্রামে টাঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন। পুলিশ সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতে যায় ও তাঁহাদের নিকট হইতে রিভলভার ইত্যাদিও পায়। পুলিশ তাঁহাদিগকে ধরিতে যাইলে তাঁহারা গুলি চালান ও একজন পুলিশ বিশেষরূপে আহত হন। পরে প্রকাশ পায় ইঁহারা নাকি কোনও খাজানা লুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই ইঁহার্দের কর্ম্মকুশলতা যে পুলিশ দেখিবামাত্র ইঁহাদিগকে সন্দেহ করে।

এই উপলক্ষে কিন্তু গ্রামের লোকেরাও পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল। গ্রামের লোকদের ধারণা হয় যে পুলিশ মামুলি চোর ডাকাত ধরিতেছে, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অবশ্য তাহারা পুলিশকে সাহায্য করে। ইহারও কিছুদিন পরের ঘটনা বলিতেছি, তখন বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবময় ধর পাকড়ের ধূমে এক বিচিত্র কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, ভাই-পেয়ারাসিং নামের একটি যুবককে ধরিবার জন্য পুলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ একদিন এক পুলিশঘোড়সওয়ারকে একটি যুবকের পিছনে পিছনে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে দেখা গেল। এইরূপে যুবকটি প্রায় মাইল তিনেক ছুটিলেন। ঘোড়ার সহিত প্রতিযোগিতায় আর যেন পারিতেছেন না এমন সময় তাঁহারই স্বগ্রামবাসী আসিয়া পথ প্রতিরোধ করায় তিনি ধরা পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পুলিশ সওয়ার আসিয়া বহুদিনের পলাতক ভাইপেয়ারা সিংকে ধরিল। গ্রামের লোকেরা যখন জানিতে পারিল যে যাঁহাকে তাহারা ধরিয়াছে তিনি তাহা-দেরই গ্রামের সুপরিচিত ও সকলেরই বড় প্রিয় ভাই পেয়ারা সিং তখন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না। এই ভাই পেয়ারা সিংএর সহিত যিনিই মিশিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইয়াছেন তিনিই ইঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইঁহার পেয়ারা নাম সার্থক হইয়াছে। ইনি যেমন নম্র প্রকৃতির ছিলেন তেমনই ইঁহার চরিত্রের মধ্যে কেমন এক শান্ত, সমাহিত ও সুসংযত তেজেরও আভাস পাওয়া যাইত। গ্রামের লোকেরা সত্যই ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল এবং বিধির নির্ব্বন্ধে এই মুগ্ধ গ্রামবাসীরাই যেন স্বহস্তে তাহাদের প্রিয়জনকে পুলিশের কবলে সমর্পণ করিল।

যাহা হউক পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারীর খবর পড়িয়া আমরা একটু বিচলিত হইলাম, কারণ প্রতিক্ষণ আমরা এই ভাবিতেছিলাম যেন এরূপ মহাসুযোগ কোনও অনবধানতার জন্য নষ্ট হইয়া না যায়। এদিকে আমাদের দলের উপযুক্ত দুই একটি ছেলেকে আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয় বলা হইল। এখন হইতে আমরা অন্য কোনও দিকে মনোযোগ না দিয়া কি করিয়া সৈনিকদিগের মন পরিবর্ত্তন করা যায় কেবল এই দিকে আমাদের সকল সামর্থ্য নিয়োগ করিলাম। একদিন আমিও আমার একটি মারাঠি বন্ধু সেনাবারিকের দিকে গেলাম। সোজা বারিকে না গিয়া প্রথমে আমরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কারণ যদিই আমাদের কেহ অনুসরণ করে ত যেন সেনাবারিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ হইয়া না পড়ে। ষ্টেশনে পঁহুছাইবার পর রেলের লাইন ধরিয়া বারিকের দিকে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশনে পৌছাইতে ও ষ্টেশনের লম্বা প্লাটফর্ম্ম পার হইতে হইতে আমাদের কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইত। আর যখন রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিতাম তখন সবই সুস্পষ্ট হইয়া যাইত। সেনাবারিকে যাওয়া আসার সময় কোনও দিন আমরা অনুসৃত হই নাই। রেলের লাইন আসিয়া সেনাবারিকের পাশ দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড মাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে আসিয়া দেখিলাম দুইটি শিখ যুবক সেনাবারিক হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় বাজারের দিকে যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, তাঁহাদের পল্টনের নাম কি, তাঁহাদের হাবিলদার কে, পল্টনে সে সময় কত লোক ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কোথায় ছিলেন, এখান হইতে তাঁহাদের শীঘ্র বদলি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, ইংরাজবারিকে কত সৈন্য আছে, এবং তাহারা কতদিন ধরিয়া এখানে আছে, ইত্যাদি নানা কথা তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। সব কথারই উত্তর দিয়া তাঁহারা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমাদের উপর হামলা করিবে নাকি?' আমরাও উচ্চরবে এমন হাসি হাসিয়াছিলাম যে সে হাসির পর আমাদের প্রশ্নসংক্রান্ত কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। তাঁহারা একদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে বারিকের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বারিকের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের ভরসা হইল না। একটু পরেই আর একটি

শিখ রাস্তার দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে আমরা হাবিলদারের কথা জিজ্ঞাসা করায় বারিকের একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে সেইদিকে যাইতে বলিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। আমরা মনে করিলাম বোধ হয় বাহিরের লোকও অনায়াসেই বারিকের মধ্যে যাইতে পারেন। কিন্তু তবুও বারিকের কাহারও সহিত কোনরূপ পরিচয় না থাকায় সেদিন বারিকে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। দেশী ও ইংরাজ সৈন্যের কতক খবর লইয়া সেদিন সহরের দিকে ফিরিলাম। কাশীতে শিখ সৈন্য আছে দেখিয়া সেদিন কত উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, কারণ পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম শিখদিগকে অতি সহজেই উত্তেজিত করিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া ভাবিলাম যদি এই শিখদল আরও কিছুদিন এখানে থাকে ত পাঞ্জাব হইতে শিখ নেতাদিগকে এইখানে আনিয়া অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার করা যাইবে। সেদিন আমি কেবল এইটুকু কামনা করিয়াছিলাম যে এই শিখদল যেন আরও কিছুদিন এখানে থাকে। এই সময় কোনও সৈনিকদল বেশীদিন একস্থানে থাকিত না। এই দলও অল্পদিনের মধ্যেই বহুস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছিল এবং কবে যে পুনরায় ইহারা এখান হইতে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন তাহারও কিছু স্থিরতা ছিল না।

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। যথা সময় ষ্টেসনে গেলাম। হু হু করিয়া পাঞ্জাব মেল ষ্টেসনের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। মনে হইল আমাদের বিপ্লবায়োজনের সহিত আমাদের ইঞ্জিনের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাই তার প্রচণ্ড বেগ দেখিয়া মনে হইল যেন পাঞ্জাবের বিপ্লববার্ত্তা বহন করিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, এখনই পাঞ্জাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে দেখিতে এই প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু গাড়ীতে পৃথ্বী সিংএর দেখা পাইলাম না। কত খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্জাবীদের উপর বড় রাগ হইল, ভাবিলাম পাঞ্জাবীদের মোটে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন কি করা যাইবে। উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা ত সোজা নহে। দাদাকে গিয়া সব কথা বলিলাম। ভাবা গেল হয়ত কোনও কারণে পৃথ্বীসিং ওই তারিখে আসিয়া পঁহুছাইতে পারেন নাই, সেই জন্য পরের দিন আবার ষ্টেসনে গেলাম, সেদিনও দেখা পাইলাম না। তার পরের দিন গিয়াও দেখা পাইলাম না।

(৫)

দাদার পরামর্শে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাঙ্গলাদেশে চলিয়া গেলাম।

যদিও বলিতেগেলে দাদাই সারা উত্তর ভারতের প্রকৃত নেতা ছিলেন তথাপি দলের পূর্ব্বানুবর্ত্তী পদ্ধতি অনুসারে আমাদের কার্য্যকলাপ আরও দুই একজনাকে জানাইতে হইবে। রাসবিহারী প্রথমে আরও অনেকের মতই দলের একজন অতি সাধারণ কর্ম্মী ছিলেন। ক্রমে স্বীয় অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার গুণে সকলের অলক্ষ্যে এক বিচিত্র সংগঠনের সৃষ্টি করিয়া যেন সহসাই একদিন বিপুল কর্ম্মভার নিজের স্কন্ধে লইয়া নেতৃবর্গের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করেন। যাহা হউক পাঞ্জাবের পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার কথা আনিব না।

এই সময় আমাদের দলের প্রসার পূর্ব্ব বাঙ্গলার শেষ সীমান্ত হইতে পাঞ্জাব প্রবেশের সূচনা করিতেছিল। আমাদের প্রধান নেতা ও পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় নেতৃবৃন্দকে পাঞ্জাবের নবীন সংবাদ দেওয়াই আমার বাঙ্গলাদেশে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গলার কাহাকেও তখন কলিকাতায় পাইতাম না, কেবল যথা স্থানে খবর দিয়া রাখিলাম যেন যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব্ববাঙ্গলার কেহ একজন কাশীতে একবার আসেন এবং পরে কেন্দ্রের নেতৃবর্গের নিকট গিয়া পাঞ্জাবের সকল সমাচার বিশদ ভাবে বলিলাম। তাঁহাদের মধ্যেও এক নব উৎসাহের তরঙ্গ লক্ষ্য করিলাম বটে কিন্তু এতটা যেন তখনও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের কথা বার্ত্তা হইল। যদি বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হয় এবং যদি অবস্থা বিশেষে আমাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ না দিয়া পিছু হটিতে হয় ত সে সময় কোথায় আমরা আশ্রয় লইব; আমাদের খাদ্য সামগ্রী কিরূপে সরবরাহ করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ সূত্র কিরূপে রক্ষা করা যাইবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সে সকলের উল্লেখ করিয়া এখন কোনও লাভ নাই। আমাদের নেতৃবর্গের নিকট আমার আরও একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল; বিদেশ হইতে অনেক শিখদল তখনও দেশে ফিরিতেছিলেন এবং অনেকেই কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া পাঞ্জাব যাইতেছিলেন। আমি নেতাদিগকে এইরূপ বিদেশাগত শিখদলের সহিত সংযোগ সূত্র স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে বলিলাম। খুব শীঘ্রই যে প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহার আয়োজন এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত এ কথাও পরে আলোচিত হয়। পরিশেষে আমাদের অতি পুরাতন অথচ নিত্যনূতন আত্মসমর্পণ যোগের কথা ওঠে। এই কথা আরম্ভ হইলে আর যেন শেষ হইত না। পন্থা যতইকেন একই আদর্শ প্রণোদিত হউক না,

সেই একই কথা, একই ভাব, জনে জনে কত নূতন ভঙ্গীতেই না বিকাশলাভের চেষ্টা করে! তাই আমরা একভাবের ভাবুক হইয়াও, একই পন্থার অনুসরণকারী হইয়াও আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত অসংখ্য স্থানেই না অমিল ছিল! গায়ক সে একই ব্যক্তি; কিন্তু সেই গায়কেরই সেই একই স্বরলহরী পাঁচজন শ্রোতার নিকট কত বিভিন্ন প্রকারের মূর্চ্ছনারই না সৃষ্টি করে! মিলও যথেষ্ট থাকে, কিন্তু অমিলও কি কম থাকে? যে আদর্শ প্রণোদিত হইয়া আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলাম, সে ভাব স্রোতের তরঙ্গ একই স্থান হইতে আসিলেও বিভিন্ন আধারে তাহা আপন বৈচিত্র্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আমাদের আদর্শের এই খুটিনাটির দ্বন্দ্বে এমন কত রাত্র পোহাইয়া ভোর হইয়া গিয়াছে, দ্বন্দ্ব কিন্তু মিটে নাই, একজন আর একজনকে ভুল বুঝিয়া যখন পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, উষার রক্তিম রাগ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমটির মত তখন পূর্ব্বগগনে ভাসিয়া উঠিত। পথ অতিক্রম করিতে করিতে নিদ্রালস-নয়ন-পল্লবের মৃদু আক্ষেপে বুঝিতে পারিতাম কতখানি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিশাবসানের পূর্ব্বেই এইসব কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইত এবং পরদিবস নানা কর্ম্মের অন্তরালে গত রাত্রির আলোচনাপ্রসঙ্গ পুনরালাপের জন্য যেন অনুক্ষণ অবসর খুঁজিয়া বেড়াইত, কত দিবস কত কার্য্যাবকাশের মধ্যে কখন যে আসিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিত যেন জানিতেই পারিতাম না। এইরূপে ভাব ও কর্ম্মের মোহন আবেশে আমাদের বিচিত্র জীবন যাপিত ও গঠিত হইতেছিল।

কাশী ফিরিয়া দাদার নিকট শুনিলাম কার্য্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে। দাদা বলিলেলেন, "আজই বিকালে অমুক বাগানে একটি সিপাহির আসিবার কথা আছে, তুমি আজ সেখানে যাইবে।" শুনিলাম সেই শিখ পল্টন বদলি হইয়া কাশী হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক রাজপুত পল্টন আসিয়াছে। বিকালে সেই বাগানে গেলাম। যে বন্ধুটি আমায় বাগানে লইয়া গেলেন পথে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে তাঁহাদের সহিত এই দলের পরিচয় হইল। বন্ধুবর বলিলেন "ইহারা বাজার ইত্যাদি করিতে আসিতেন, একদিন কেন্টোন্‌মেণ্টে যাইবার সময় পথে ইঁহাদিগকে সহরের দিকে আসিতে দেখি, আমরাও ইঁহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া বাজারের দিকে ফিরিলাম। পথে বর্ত্তমান যুদ্ধসংক্রান্ত নানা কথা হইল। হিন্দু মুসলমান

সম্বন্ধীয়ও অনেক কথা হইল। হিন্দুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের কথা হইতে হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে প্রথমদিনের পরিচয়ের পর তাঁহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা আছে এবং সেইজন্য আর একদিন এইদিকে আসিতে বলিয়া তাঁহাদের নাম ধাম জানিয়া লইয়া সেদিনের মত তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। পরেরদিন পুনরায় তাঁহারা গঙ্গাস্নানের জন্য সহরে আসিলেন। সেদিন তাঁহাদের নিকট আমাদের ভিতরকার কথা পাড়িলাম। অন্যান্য আলোচনার পর বর্ত্তমান যুদ্ধে বিদেশে বিধর্ম্মিদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চাইতে স্বদেশে স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইলাম। দেখিলাম অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। স্বীয় পল্টনে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত এ বিষয় আলাপ করিয়া পুনরায় আজ আসিবার কথা আছে।" অল্পক্ষণ অপেক্ষার পর দেখিলাম হাতে বাজারের সামগ্রী লইয়া একটি লোক আসিতেছেন। বন্ধুবর বলিলেন ঐ আসিতেছেন। ইঁহার পরিচ্ছদ আপাদমস্তক ধপধপে সাদা ছিল, যেন অন্তরের পরিশুদ্ধতা বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটির সহিত আলাপ করিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ নমনীয়তা যেন ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখান ছিল। ইঁহার মধ্যে কেমন এক উৎফুল্ল ও উৎসাহের ভাব দেখিয়াছি কিন্তু উত্তেজনার ভাব দেখিনাই। ইঁহার সহিত সেদিন একবারে বারিকের ভিতর গিয়া ইঁহাদের খাটে বসিয়া কত গল্প করিয়াছিলাম। আমরা ইঁহাদের খাটে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম এবং ইঁহারা আমাদের আদর অভ্যর্থনার জন্য নিকটের বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩২)

চারুর বাড়ী হইতে একেবারে বাসায় না ফিরিয়া রাখু প্রথমে গঙ্গাস্নান সারিয়া লইল। পথের মাঝে মাঝে যেরূপ জল জমিয়াছিল, আর সেজন্য পথ চলায় সে এমনি অসুবিধা বোধ করিতেছিল, বরাবর বাসায় যাইলে তাহার সেদিন স্নান করিতে আহার আর সময় থাকিত না। গঙ্গাতীর হইতেও সে একেবারে বাসায় ফিরিল না। নিকটেই ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সে মনে করিল যাইবার পথে তাঁহাদের খবরটা দিয়া যাই, যথাসময়ে পূজার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে তাঁহারা আজও আসিবার বিষয় সন্দেহ করেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে আকাশও পরিষ্কার হইবার ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু বাতাস তখনও বেশ প্রবল। সে বাবুর বাড়ীর দোর বন্ধই দেখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সদর দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই দেখিল, ভৃত্য হেম একটা ছাতা মাথায় দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে।

বাহির হইতেই তাহার কথা বলিবার সুবিধা হইল বুঝিয়া যেমন রাখু হেমকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে দেখিল তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, হেম ছাতা মুড়িয়া চোখের নিমেষে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। যখন রাখু দরজার মুখে উপস্থিত হইল, তখন হেমের অস্তিত্ব চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইল না।

ওরূপ লুকোচুরি ভাবে চাকরটার চলিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিলেও রাখুর কেমন একটা খটকা লাগিল। কিন্তু চারুর বাড়ীতে রাত্রিবাস সম্বন্ধে হেমের যে উক্তরূপ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা একেবারেই রাখুর মনে আসিল না। সে তো জানিত না যে হেমই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে মনে করিল হয়তো বাড়ীর মেয়েদের কেহ বাহির বাটীতে আসিয়াছে, সেইজন্য হেম তাহাকে সতর্ক করিতে ছুটিয়া গেল। এর পূর্ব্বে

এত প্রাতঃকালে সে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কখনও পূজা করিতে আসে নাই। অন্য দুই তিন বাড়ীর পূজা সারিয়া সেখানে আটটার পূর্ব্বে কোনদিন সে আসিতে পারে নাই।

অন্য অন্য দিন রাখু বরাবর ভিতর বাড়ীতেই চলিয়া যাইত। আজ আর সে তাহা করিল না কি জানি কাপড় কাচা গা ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া মেয়েরা যদি অসাবধানে থাকে? ভিতর দিয়া যাইতে গেলে কলতলার পাশ দিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বহির্বাটীর কোনও স্থানে সে হেমকে দেখিল না। সে বাহিরের সিঁড়ি দিয়াই উপরে চলিল। কেমন একটা চিন্তা তাহার মনকে ঘেরিয়াছে, সে মাথা হেঁট করিয়া সিড়িতে উঠিতে ছিল শেষ সিড়িতে পা দিয়া প্রথমে মাথা তুলিতেই দেখিল, বাড়ীর গিন্নি সিড়ির পাশেই বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়েদের আবরু তখনকার কলিকাতার সাধারণ হিন্দু গৃহস্থদের অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল। বাড়ীর পুরুষদিগেরও, দিবাভাগে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে গলায় সাড়া না দিয়া প্রবেশাধিকার থাকিত না। মেয়েরা কদাচ, বাড়ীতে একেবারে পুরুষ না থাকিলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে আসিত। অধিক কি শুভা বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পর হইতে আর বাহির বাড়ীতে আসিতে পাইত না।

রাখু সেটা জানিত। সে প্রায় তিনমাস ইঁহাদের ঘরে ঠাকুর পূজার কাজ করিতেছে। এই তিন মাসে সে দেখিয়া শুনিয়া ইঁহাদের আবরুর ব্যবহার বুঝিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যিনি এখানে পূজার কাজ করিতেন তিনি বৃদ্ধ, রাখুরই দেশস্থ। শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁর দেশে যাইবার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান জানিয়া তিনি রাখুকে এখানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কেন না, আবরু একটু বেশী রকম হইলেও, মেয়েরা পুরোহিত অথবা পূজকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে বিশেষ সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না।

রাখু বৃদ্ধের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া এই গৃহে কয়মাস পূজার কাজ করিতেছে। সে অতি সঙ্কোচের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার সেইরূপ সঙ্কোচেই পূজা সারিয়া চলিয়া যায়। চক্ষু তাহার মেয়েদের মুখের সঙ্গে কচিৎ পরিচিত হইয়াছে। বৃদ্ধের উপদেশ মত সে ব্রজেন্দ্রের বিমাতাকে

মা বলে, নির্ম্মলাকে বউমা বলে, শুভাকে কেবল দিদি বলিয়া ডাকিতে পায়।

সুতরাং উপরে উঠিয়াই নির্ম্মলাকে বারান্দা ধরিয়া একটু অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাখু কিছু অপ্রতিভের মত হইল। তাঁহার মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই বলিবার কথা ঠিক করিতে না পারিয়া মাথা নামাইয়া আবার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "আপনি এখানে আছেন তা জান্‌তুম না।" নির্ম্মলা অতি শান্তভাবে উত্তর করিল "আপনাকে এদিকে আস্‌তে দেখেই আমি দাঁড়িয়েছি। আপনি কি এখনই পূজা কর্‌বেন?"

"পূজার কি আয়োজন হয়েছে?"

"হয়নি একটু অপেক্ষা করলেই করে দি।"

"তা হলে আমি আসি?"

"কখন আসবেন?"

"আসতে একটু বেলা হবে, এই কথাই আমি বল্‌তে এসেছিলুম।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন না?"

"আমি এখনও বাসায় যাইনি। দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল আমাকে এক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছিল।"

একথাটা যে নির্ম্মলা রাখুর মুখ হইতে এত শীঘ্র শুনিবে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুনিবামাত্র তাহার মুখে হাসি আসিল। কোন ক্রমে হাসি সংযত করিয়া সে বলিল—"আমি মনে করেছিলুম ঝড়ের জন্য কাল আপনি ঠাকুরের শীতল দিতে আস্‌তে পারেন নি।"

"বাসায় থাকলে নিশ্চয় আসতুম।"

সমস্ত জানিয়াও, নির্ম্মলা রহস্য করিবার একটু সুবিধা পাইয়া সেটা ছাড়িতে পারিল না। সে ঈষৎ সমবেদনার ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবেত কাল রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে?"

"না বউমা বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে কাল অনেক বেশী সুখে ছিলাম।

"তা হলে নারায়ণ বিপদে আপনাকে ভাল আশ্রয়ই দিয়েছিলেন বলুন?"

রাখু উত্তর করিল না।

"তারা কি ব্রাহ্মণ?"

"না।"

"কায়স্থ?"

"না।"

আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হয় বুঝিয়া নির্ম্মলা প্রশ্ন করিল—

"আপনার তাহলে তো কাল আহার হয়নি!"

"অন্ন হয়নি তবে ফল মূল মিষ্টান্ন খেয়েছি।"

ঠিক এমনি সময়ে হেমকে ঘর হইতে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে রাখু নির্ম্মলাকে বলিল—"বেলা হয়ে যাচ্ছে বউমা, আমি এখন আসি।"

"আসুন।"

কিন্তু রাখু দুই তিনটা সিড়ি নামিতেই নির্ম্মলা বলিল—"একটু দাঁড়ান। ঠিক এমনি সময়ে বৃষ্টি আবার বেশ জোরে চাপিয়া আসিল। নির্ম্মলা আবার বলিল—"আমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আস্‌চি। আমার না আসা পর্য্যন্ত যাবেন না" বলিয়াই সে দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এইরূপ হঠাৎ দাঁড়াইতে বলিবার কারণটা না বুঝিতে পারিলেও কতকটা বৃষ্টির জন্যও কতকটা তাঁর মান রাখিবার জন্য রাখু উপরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলা ফিরিল। তার একহাতে একখানা গরদের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর অন্যহাতে একটা ছাতি। নিকটে আসিয়াই সে রাখুকে কাপড়খানা পরিতে বলিল। বলিল—'ভিজে কাপড় চাদর ছেড়ে ছাতিটা নিয়ে চলে যান।"

রাখু বলিল—"না বউমা, প্রয়োজন নেই।"

"আপনার নেই আমার আছে, কাপড়খানায় আলতার রং লেগে আছে। কি জানি কেউ দেখে কি মনে করবে।"

চারুর ঘর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতায় মূর্খ ব্রাহ্মণ কাপড়খানার অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্ম্মলার কথায় এখন কাপড়ের দিকে চাহিয়া সে একরূপ আড়ষ্টের মতই হইয়া গেল। নির্ম্মলা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দিল না। সে বলিল—"আপনি ঠাকুর এযুগের লোক নন, সুতরাং কলিকাতার লোকের স্বভাব আপনি কিছুই জানেন না। আপনার যে ব্যবসা কাজ কি, লোককে সন্দেহ করতে দেবারই বা দরকার কি? ঐখানে ছেড়ে রেখে যান, আমি কাচিয়ে ঠিক করে রেখে দেবো।"

বলিয়া নির্ম্মলা রেলিংএর কাপড় চাদর ও ছাতি রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রাখু এই সময়ের মধ্যে আর একবার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল, "আমি কি আবার আস্‌বো?"

"সে কি এ আপনার ঘর, আপনি আসিবেন না কেন? শুধু আসা কি, বল্‌তে ভুলে গিছলুম—আজ এই বাদলে হাত পুড়িয়ে আপনি রেঁধে খাবেন না। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আপনি এই খানেই প্রসাদ পাবেন। আমার নিমন্ত্রণ করা রইল।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেল। এক দয়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে আর এক দয়ার আয়ত্তে পড়িয়া রাখু গোটা কতক চক্ষুজলে গরদের কাপড়খানা সিঞ্চিত করিয়া লইল। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ভিজা কাপড় চাদর নির্ম্মলার কথামত সেইখানেই রাখিয়া সেই বৃষ্টিতেই ছাতি খুলিয়া নামিয়া গেল। এতক্ষণ ব্রজেন্দ্র ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে ঠেশ দিয়া চোরটির মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছিল। আর হেমা এক একবার ঘর হইতে উঁকি দিয়া রাখুর চলিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইল। হেমা দূর হইতে এক একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তাঠাকুরাণীর ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবারে সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাখুর পরিত্যক্ত অলক্তক রঞ্জিত বস্ত্র দেখিল। বামুনের রাত্রি-বাসের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শন অতি উল্লাসে সে প্রভুকে দেখাইল। ফলে আবার সে ধমক খাইল! নূতন পূজারী আনিবার কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু তাকে বলিল, গিন্নিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আর কোন কিছু না করে। সকল কাজে বাধা পাইয়া হেমা যেন মনমরা হইয়া গেল! রাত্রের ব্যাপার লইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সে যে এতটা চেষ্টা করিতে গেল বোকা প্রভুর জন্য সেটা তার সফল হইল না। ইহার উপর তার প্রভুপত্নী যখন তাকে শুধু নূতন বামুন আনিতে নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, রাখুকে বলিতে এমন কি আর কাহারও কাছে পূর্ব্বরাত্রির একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল, তখন তার সমস্ত বুদ্ধি জমাট বাঁধিয়া তাহাকে একবারে নীরব করিয়া দিল।

ইহার একটু পরেই বিশু আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে শুনাইল তাহার 'মা' ভোর-বেলায় সেই যে গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া বাহির হইয়াছে এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরে নাই। সে এবং ঝি দুজনেই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও খোঁজ পায় নাই। এ কথা নির্ম্মলার শুনিতে বিলম্ব হইল না, ব্রজেন্দ্রই কাল বিলম্ব না করিয়া কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিল।

শুনিয়া যদিও নির্ম্মলা চারুর না আসায় নষ্টামির একটা ছিনালি ছাড়া তার বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কিছু দেখিল না, তথাপি সে স্বামীকে বলিল "এরূপ অবস্থায় সেখানে তোমার একবার যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বিশুকে আগে পাঠাইয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ী চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ডালি

স্বাধীনতা

(শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি)

"মৌলানা হজরত—মোহানি কংগ্রেসে এবং মস্‌লেম লীগের প্রেসিডেণ্ট-রূপে স্বাধীনতার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ দুই বারই তিনি পরাস্ত হইয়াছেন। মৌলানার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুই নাই। ইংরাজেরা আমাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করিলেও, খিলাফৎ-সমস্যার সুচারু সমাধান হইলেও, তিনি তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চাহেন। 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' লাভ করিতে—না পারিলে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—এ ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না। এ স্থলে আমরা কেবল মতবাদের আলোচনা করিতেছি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে যদি খিলাফতের মীমাংসা না হয়—অর্থাৎ যদি ইংরাজ সরকার মোস্‌লেম জগতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলতাচরণই করিতে থাকে তাহা হইলে যে আমাদের বাধ্য—হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোনই মতভেদ নাই। ইংলণ্ড মুসলমানের মিত্র হইতে সম্মত না হইলে ভারত কিছুতেই ইংলণ্ডের সমর্থন করিতে পারে না বা তাহার নিকট বৈষয়িক বা নৈতিক কোন প্রকারের সাহায্যই গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু আমি জানি ভারত প্রতাপশালী হইলে ইংরাজের ভাব অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জেদ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও অন্যায় হইবে কারণ—তাহাতে আমাদের প্রতিশোধস্পৃহা এবং অসামঞ্জস্যই সূচিত হইবে।

ইংরাজকে শত্রুতে পরিণত করাতে বা সুযোগ পাইলেই তাহাকে ভারত-হইতে বিতাড়িত করায় ভারতের গৌরব পর্য্যবসিত হইবে না, তাহাকে বন্ধু-ভাবে, আমলাতন্ত্র প্রধান সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে এক অভিনব সাধারণ তন্ত্রের সভ্যরূপে গ্রহণ করাতে ইহার পর্য্যবসান ঘটিবে। এই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর দুর্ব্বলতর, অনুন্নত জাতি সমূহের শোষণের উপর, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুবলের উপর ঘটিবে না।

ইংরাজ শাসনের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে 'স্বরাজ' অর্থে কি বুঝায় দেখা যাউক। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে এই 'স্বরাজ' দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং 'স্বরাজ' ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ গণ্য হইবে না, ইহাতে ভারতের আত্মপ্রকাশই সূচিত হইবে। পার্লামেণ্টের বিধিবিশেষ দ্বারাই স্বরাজ ঘোষিত হইবে ইহা সত্য কিন্তু সে বিধির ভারতের লোকমতের সমর্থন ভিন্ন পৃথক্ কোন সংজ্ঞা থাকিবে না। 'হাউস্ অব্ কমন্স (House of Commons) দক্ষিণ আফ্রিকার 'ইউনিয়ন স্কিমের" (union scheme) একটি বাক্য বা বাক্যাংশ মাত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিবে তবে এ স্থলে এ 'সমর্থন' ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধিস্বরূপ গণ্য হইবে।

এরূপ 'স্বরাজ' এ বৎসর না আসিতে পারে, একপুরুষের মধ্যেও না আসিতে পারে, তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত নহি। মিটমাট হইবার সময় আসিলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে ভারতের লোকমতের সমর্থন করিতেই হইবে কিন্তু সে লোকমত আমলাতন্ত্রের মারফত পার্লামেণ্টে পৌঁছিবে না, স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই এ লোকমত প্রকাশের যন্ত্র হইবেন।

কোনও জাতি কখনও অধীন জাতিকে 'স্বরাজ' উপহার দিতে পারে না, জাতির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবন গুলির বিনিময়েই এ অমূল্যরত্ন ক্রয় করিতে হয়। এ রত্ন পাইবার জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতে পারিলে ইহার 'উপহারত্ব' দূর হইবে। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন 'তরবারির সাহায্যে আদায় করিতে না পারিলে পার্লামেণ্টের মারফত ভিন্ন স্বরাজ আসিতে পারে না।'

ইংলণ্ড ভারতের নির্য্যাতনবরণরূপ নৈতিক 'চাপ' সহ্য করিতে অসমর্থ—শ্রোতাগণকে একথা অনুমান করিতে দিয়া তিনি ইংলণ্ডকে 'ছোট' করিয়াছেন আর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবেচনা না

করিয়া যখন খুসী স্বরাজ দিবে একথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে শ্রোতাগণের বুদ্ধিশক্তিকে অপমান করা হইয়াছে। মোট কথা—স্বরাজ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অসহনীয় যন্ত্রণাভোগের ফল।

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি তরবারির পরিবর্ত্তে স্বরাজ লাভের অন্য কোন উপায় কল্পনা করিতে পারেন না, এজন্য সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে শাসন পরিষদগুলিতে গলাবাজি করিয়া আমরা এক সময়ে ব্রিটিশপার্লামেণ্টকে স্বরাজ দানের প্রয়োজনীয়তা বা স্বরাজ প্রাপ্তির উপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ হইব কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিবেন তরবারি অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর পন্থাও আছে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধই সেই পন্থা। ভারতের 'নিজস্ব' ফিরিয়া পাইতে হইলে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই পথ, আর নিরুপদ্রব প্রতিরোধই যে ক্লেশসহনের পথ সুগম করিয়া দিবে তাহা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইতেছে।

আমরা আমাদের 'নিজস্ব'—এখনও পাই নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করেন, অস্পৃশ্য জাতিগুলি এখনও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য অনুভব করে নাই। পার্শি ও খৃষ্টানগণ এখনও নিশ্চিন্তরূপে জানেন না 'স্বরাজের' অধীনে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে; এখনও আমরা নিজেদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা বা কৌশল সম্যক্ শিক্ষা করিতে পারি নাই, এখনও 'খাদি' জাতীয় পরিচ্ছদে পরিণত হয় নাই, এখনও চরকা প্রতি গৃহস্থালীতে স্থান পায় পাই অর্থাৎ এখনও আমার আত্ম-রক্ষার কৌশলগুলি বুঝিতে ও শিখিতে পারি নাই।

এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ মনে করেন 'হিংসা' ভিন্ন 'স্বরাজ' মিলিতে পারে না। এই মতের পোষণকারিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও বর্ত্তমানে নিতান্ত নগণ্য নহে। ইঁহাদের মতে 'হিংসা' ও 'অহিংসা' উভয়কেই একত্র অবস্থান করিতে দেওয়া উচিত অর্থাৎ 'অহিংসা' 'হিংসার' জন্য প্রস্তুত হইবার উপায়-রূপে ব্যবহৃত হউক। ইহারা জানেন না জগৎকে কতখানি প্রতারিত করিতেছেন। লক্ষসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়রূপে অহিংসানীতির উপকারিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—ইহাই আমাদের 'প্রতিজ্ঞা'। 'অহিংসা' দ্বারা অথবা 'হিংসা' ভিন্ন স্বরাজ লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস যাঁহার জন্মিবে তৎক্ষণাৎ আপন 'প্রতীজ্ঞা' নাকচ করিতে তিনি নৈতিক হিসাবে বাধ্য। যতদিন সম্ভব অহিংসা আমাদের ধর্ম্ম থাকিবে। পরীক্ষাত্মক বলিয়াই অহিংসানীতির উপযোগিতা এত অধিক। যতদিন 'অহিংসা' আমাদের ব্রত থাকিবে ততদিন শুধু যে নিজে ইহার উপকারিতায় সম্যক্ বিশ্বাস করিতে ও কার্য্যে ইহা আচরণ করিতে হইবে তাহা নহে, অন্যকে হিংসানীতি বর্জ্জন করাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে এবং ইহার আচরণকারি-গণের প্রতিবাদ করিতে হইবে। যাঁহারা কংগ্রেসের অনুশাসনকে মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কথায় ও কার্য্যে অহিংস থাকেন নাই এবং 'চিন্তায়' অহিংস থাকিবার চেষ্টা করেন নাই, এজন্যই আমার এখন পর্য্যন্ত লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া)

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

জাতীয়শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ইহাকে একটী বিশিষ্ট আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা আমরা এতদিন পাইয়া আসিয়াছি, তাহা যেন ঠিক আমাদের উপযুক্ত হয় নাই। এ যাবৎ যাঁহারা এ শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল—তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, এই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে একটা প্রকাণ্ড গলদ রহিয়া গিয়াছে। অসহযোগীরা বলেন এ শিক্ষার প্রধান গলদ—Slave Mentality—অর্থাৎ দাসজনোচিত মনোভাবের সৃষ্টি। কথাটী আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার দোষ এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। কতকগুলি বিজাতিদ্বেষী ইংরাজ শিক্ষক ও লেখক হয়ত এ ভাবটী সৃজনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজের ইতিহাস বা সাহিত্য ইহার জন্য দায়ী নহে। ইংরাজ ব্যবসায়িগণের কল্যাণে যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে দেশীয়গণের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল—এবং নানাবিধ বৈদেশিক বিলাসব্যসনের আতিশয্যে আমাদের ঘর ও বাহির, মন ও দেহ ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল—

সেই সময় ইংরাজীশিক্ষার মন্ত্রপ্রভাবে আমাদের নিকট অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ খুলিয়া গেল; সেটী ইংরাজের আপিস-আদালত ইত্যাদি কর্ম্মস্থানে চাকরি গ্রহণ। ক্রমে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতগণ চাকরির নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে—"যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত"; ছেলেবেলায় যখন লেখাপড়ায় একটু-আধটু শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছি তখনই আমাদের নিকট প্রলোভনের চিত্র ধরা হইয়াছে - লেখাপড়া শিখিলে বড় চাকরী পাওয়া যায়—উকিল হওয়া যায়, জজ্-ম্যাজিষ্টর হওয়া যায়, গাড়ী-ঘোড়া চড়া যায়, "লেখা পড়া শিখে যেই গাড়ী ঘোড়া চরে সেই।" এই আরাম উপভোগ বর্ত্তমান শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। এ শিক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না। জীবনকে এক অখণ্ড সত্যরূপে উপলব্ধি করাইবার শক্তি এ শিক্ষায় নাই; এ চায় শুধু আরাম, শুধু উপভোগ,—অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব, নিজের উপর নহে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া তাহার চরম পরিণতির প্রতি ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই—উহার গতি জীবনের চরম পরিণতির দিকে। আর্য্যেরা মানবজীবনের চারিটী স্তর আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্য্য —ছাত্রজীবন; সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ও কঠোরতার দ্বারা জীবন-গঠন—তাহার সম্মুখে কোনরূপ আরামের চিত্র ধরা হয় নাই। কঠোর সংসার-সমরক্ষেত্রে যেরূপ সংযতভাবে সৈনিকপুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে—তাহারই উপযোগী শিক্ষা সে পাইবে। তারপর গার্হস্থ্য; এখানেও ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয় চরিতার্থে নয়। অতিথিসেবা, দীন-দরিদ্র অনাথ আতুরের জন্য জীবনের সুখবিসর্জ্জন—ইহাও চাই। তারপর বানপ্রস্থ, পরে যতি। ইহাই ভারতের শিক্ষা। পরম সত্য যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত জীবনেরই লক্ষ্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রয়াস। তথাপি ভারতবর্ষ সংসারকে অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন নাই। ভোগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। সাংসারিক সুখও ভারতের অন্যতম কাম্য; তবে তাহা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া নহে। সে সুখেরও প্রারম্ভে বিদ্যাশিক্ষা আছে—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখং॥

কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের

সাথে"। সেবার যখন স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন একদল ছেলে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিল জাতীয় শিক্ষা পাইবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলেও অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছিল। অনেকে আবার ফিরিয়া গিয়াছে। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী উচ্ছেদের নিমিত্ত। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি ছাত্রগণকে অগ্র-পশ্চাৎ অনেক বিবেচনা করিয়া তবে এ আন্দোলনে যোগদিবার কথা বলিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা স্বতন্ত্র। একটী উচ্ছেদ আর একটী নব সৃষ্টি। তবে প্রথমটীর অবশ্যম্ভাবী ফল যে দ্বিতীয়টী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করিলে এতদিন জাতীয় শিক্ষার অয়োজন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পড়া চলিতেছে। দুই দশটা বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কি? ইহার সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে আমাদের জীবনের সহিত ইহার মিল নাই। সেই জন্য এই শিক্ষা আমাদিগকে জীবনের গন্তব্য পথে পরিচালিত করে না, ইহার ভারে আমরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জীবন চিন্তাক্লিষ্ট দাসত্বভারে অবনত। নূতন সৃজনের শক্তি আমাদের নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণ সমগ্র বিরাট জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। দুর্ব্বল প্রতিবাসীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে কিছু সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দিনপাত করেন। ওকালতী ডাক্তারী ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিবাদের মীমাংসায় নয়, নূতন বিবাদের সৃষ্টিতে ব্যবহারাজীবের আনন্দ; রোগ আরোগ্য করায় নয়, দেশে নূতন নূতন ব্যাধির উদ্বোধনসঙ্গীতেই ডাক্তারের আনন্দ। কোন নূতনতাবের প্রচারে গ্রন্থকারের কিছু আগ্রহ দেখি না, কি করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি সর্ব্বত্র কাট্‌তি হইবে ইহাই তাঁহার চেষ্টা। প্রতিবৎসরেই ছাত্রগণ অঙ্ক শিখিবার জন্য নূতন নূতন পাটিগণিত, বীজগণিত কিনিয়া থাকে। শিক্ষার অভাব যতই অনুভূত হইতেছে, শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যও ততই অধিক হইতেছে। আদালতে যেমন অনেক টাকা খরচ করিয়া বিচার ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ অতি উচ্চহারে বিদ্যা-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; অথচ জীবনযাত্রার পক্ষে সে বিদ্যার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, একথা বোধহয়

স্বীকার না করিলেও চলে। দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে স্থান নাই। তাহাদের নিজেদের বাসগৃহ যতই কুৎসিত হউক না কেন, বিদ্যালয়টী অট্টালিকা হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা কর্ত্তৃপক্ষ যে বিদ্যালয়কে আমলেই আনিবেন না। কেহ পাঠ করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ের পাঠাগার বহুমূল্য পুস্তক ও আলমারীতে পরিপূর্ণ করা চাইই-চাই। অথচ এই বাংলা দেশের এমন একদিন ছিল, যখন হরিঘোষের গোয়াল ঘর হইতে মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বাহির হইয়া সমগ্র দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা চালের নীচে দরিদ্র অধ্যাপকের টোলে কুমার, নৈষধ, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাণিনির নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু আজকাল শিক্ষার আয়োজনেই সর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণের নাসিকা-কুঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভার!

আজ দেশের সর্ব্বত্র কথা উঠিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—শুধু নাম পরিবর্ত্তনে নয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কারে নয়; এই শিক্ষা (অর্থাৎ এই শিক্ষাপ্রণালী) একেবারে বর্জ্জন করিয়া নূতন প্রণালীতে সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সাধারণের সহিত শিক্ষিতগণের যোগসাধন করিতে হইবে। এই মিলন যদি কখনও সম্ভবপর হয় তবেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা নহে। বঙ্গের পরিত্যক্ত পল্লীগুলিতে শিক্ষিতগণকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সহরে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিলে বা বক্তৃতা করিলে, কোনও ফল ফলিবে না। একদল ত্যাগী কর্ম্মী আবশ্যক যাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া এক একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। অনেককে মুখে বলিতে শুনিয়াছি, পল্লী-গ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, অথচ তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু সেই পল্লীরই কৃষকগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ লইয়া মটরগাড়ী চালাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। পল্লীতে আসিয়া পল্লীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধা মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে জাতীয় জীবনের মুক্তি অসম্ভব। প্রথম যাঁহারা আসিবেন সকল রকমের অসুবিধার মধ্যেই তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। নিত্য দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে। ভয় করিবে না; সাহসে ভর করিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। একনিষ্ঠ সাধকের মত তাঁহাকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। দেশের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে হয়ত একাজ অতি সহজে

পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা সহসা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে হয় না একদল শিক্ষিত যুবককে অগ্রণী হইতেই হইবে, তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সহায়তা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন দেশব্যাপী এই আন্দোলন চলিতেছে; কার্য্যারম্ভের ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

প্রাচীনভারতে গণতন্ত্র

[শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

(১)

(প্রাচীন-ভারতে প্রজাতন্ত্র রাজ্য—মালব ক্ষুদ্রক প্রভৃতি)

প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস প্রাচীন ভারতবাসী কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই, ফলে প্রাচীন ভারতের অবস্থার কথা জানিতে হইলে অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ করিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এক্ষণে কতকটা এ অভাব ঘুচিয়াছে এবং কতিপয় মহাত্মার সমবেত চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি। প্রাচীন ভারতে প্রজাদের হস্তে শাসনভার যে আদৌ ন্যস্ত ছিল না এবং রাজাই যে সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন সে ধারণা এখন কিন্তু অনেকের মনে বদ্ধমূল। বহুদিন হইতে আমরা শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি যে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ প্রজাতন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং প্রজারাও যে ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য্যের অনেকখানি হস্তগত করিতে পারে সে কল্পনা তাহাদের মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চ্চার ফলে আমরা বুঝিয়াছি যে প্রাচীন ভারতে শুধু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এমন নহে ভারতের অনেক অংশ পুরাকালে প্রজাদের দ্বারাই শাসিত হইত। ১৯০৩ সালে অধ্যাপক Rhys Davids তাঁহার "বৌদ্ধভারত" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"অতি প্রাচীনকালে ভারতের যে সকল অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল তাহার কয়েক অংশে

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল.....অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ জাজ্জ্বল্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতে ন্যূনাধিক স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া প্রজারাই খানিকটা শাসন করিত।" (Buddhist India p. p. 19-20) উক্ত সালেই Vincent Smith Royal Asiatic Society Journal এ প্রাচীন পঞ্জাবের প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত স্থান সমূহের একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে দেখাইয়াছিলেন যে ঝাঙ্গ জেলায় Maloi নামে Amritasar, Gurudaspur, Kangra এবং Hosiarpur প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে Oxydrakai নামে, এবং লাহোরের উত্তরে রাবিনদীর পূর্ব্বতীরে Kathaioi নামে প্রজাদের দ্বারা শাসিত তিনটী রাজ্য ছিল। Dr. Thomas প্রমাণ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত 'গণ' শব্দের দ্বারা যেসকল স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থানকে বুঝাইত। Mr. Jayaswal ১৯১২ সালে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের জন্য হিন্দীতে এবিষয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও পর বৎসরের Modern Review এ "An Introduction to Hindu Polity" শীর্ষক প্রবন্ধে 'গণ' শব্দ যে এইরূপ অর্থেই প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত হইত সে সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে অনেক প্রমাণ দিয়াছিলেন। Bhuler মনুস্মৃতির অনুবাদ কালে 'গণ' শব্দকে ইংরাজীতে "Corporation" (অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি) বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোনও দোষ নাই; তিনি মনুস্মৃতির টীকাকারগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। মনুস্মৃতি যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে হয়ত ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু মনুসংহিতার টীকাকারগণ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের একেবারে বিলোপসাধন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি-বুঝাইতে সংস্কৃত সাহিত্যে "সঙ্ঘয় সমুত্থান" "শ্রেণী" "পুগ" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ও তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়া "গণ" পদের প্রতিশব্দে "সমূহো বণিগাদীনাম্"এর প্রয়োগ করিয়াছেন। [মনু ১ম অঃ, ১১৮ শ শ্লোকের কুল্লুক ব্যাখ্যা]

(২)

প্রাচীন হিন্দুরাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন না—জাতক ; রামায়ণ মহাভারতাদির প্রমাণ।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস যে দিকপালগণের অংশে রাজাদের উৎপত্তি অর্থাৎ 'Divine Origin of Kings theory'টী ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া রাজারা যে

যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন এমন নহে ; এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তেলপত্ত জাতকে একটী গল্প আছে যে তক্ষশীলার একজন অধিপতি এক যক্ষিণীর মায়ায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে যক্ষিণী যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার রূপে ও মোহিনী মায়ায় রাজা এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার কোনও আব্দার রক্ষা না করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল তখন সে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইবার আশায় রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সকল ক্ষমতাই নিজহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিল। রাজা তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন—'রাজ্যের সমস্ত প্রজা আমার অধীন নহে অথবা আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদের প্রভু নহি, যাহারা রাজদ্রোহী অথবা অন্য কোনও অপরাধে অপরাধী তাহারাই আমার অধীন, সুতরাং সমস্ত রাজ্যের অধিকার আমি কেমন করিয়া তোমার হস্তে দিব ?" এই গল্প হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে যে রাজার ক্ষমতার একটী সীমা ছিল, যাহা-ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অন্ততঃ যে সময়ের কথা উপরিলিখিত পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে সে সময়ের ভারতীয় রাজগণ বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাহীন না হইলেও অনেক বিষয়ে যে তাঁহাদিগকে সংযতভাবে চলিতে হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আবার Eka-panna Jataka নামক গল্পে আছে যে এক রাজপুত্র এতই দুর্দ্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ ছিলেন যে তাঁহার নাম হইয়াছিল 'দুষ্টকুমার'। সেই দুষ্টকুমারের পিতা পুত্রের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। প্রবীণ শিক্ষক ছাত্রকে একটী বৃক্ষের মূলে লইয়া একটী বৃক্ষপত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পত্র ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই চর্ব্বণ করিবামাত্র বৃক্ষপত্রের তিক্ত আস্বাদে এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া সমূলে বৃক্ষটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সেই ঋষি বলিলেন—"রাজপুত্র ! এই বৃক্ষটী বড় হইলে ইহার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইবে এই আশঙ্কায় আপনি যেমন এটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, সেইরূপ আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া রাজা হইলে প্রজাদের প্রভূত অহিত সাধন করিবেন এই ভয়ে প্রজারাও আপনার ক্রোধপরায়ণতা দর্শনে আপনাকে রাজা হইতে দিবে না এবং আপনাকে বনে গমন করিতে

হইবে।” এই গল্পটী হইতে বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতে এককালে রাজারাও যেমন যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না তেমনি রাজপুত্ররাও যদি অনুপযুক্ত বা প্রজাদের অহিতকামী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, প্রজারাই তাঁহা-অভিষেককালে বাধা দিত।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে মহারাজ প্রতীপ যখন বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবাপিকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন প্রজা'বৃন্দ তাহাতে আপত্তি করিল। দেবাপি সুযোগ্য হইলেও রোগগ্রস্ত ছিলেন সুতরাং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় প্রজারা তাঁহার অভিষেককালে বাধা দিল। প্রতীপ তাহাদের বাধা প্রদানে দুঃখিত হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন মাত্র, তথাপি প্রজাবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেবাপিকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন নাই। আবার শান্তিপর্ব্বে আছে, সূর্য্যবংশীয় নরপতি সগর প্রজাদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসামঞ্জসাকে ক্রুদ্ধস্বভাবের জন্য স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-পর্ব্বে আছে যে, মহারাজ ক্ষণিকনেত্রকে তাঁহার প্রজাবৃন্দ অপসারিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। রামায়ণে আছে যে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণগণ, বলমুখ্য এবং পৌর ও জানপদবর্গের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। যযাতি পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রজাগণকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অভিমত অনুসারে তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয় আলোচনা করিলে বেশ দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা কতদূর সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রজাদের হস্তে কতখানি অধিকার ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র উভয়পুস্তকেই আছে যে প্রজার অর্থ অপহৃত হইলে রাজা যদি সেই অর্থের পুনরুদ্ধার করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে নিজ ধনাগার হইতে তাঁহাকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। পূর্ব্বে রাজারা এইরূপ করিতেন, তাহা না হইলে উভয় পুস্তকেই এইরূপ ব্যবস্থা করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সামান্য বিষয়েও যখন রাজাকে প্রজাদের মুখ চাহিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত তখন রাজারা যে কতকাংশে প্রজাদের করায়ত্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(ইতিহাস ও আলোচনা)

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত।

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিকৃত স্বর পাঁচটি যথা কোমল, ঋ, জ্ঞ, দ, ণ এবং কড়ি ক্ষ। নারদ মতে শুদ্ধ সপ্ত স্বর কতিপয় পশু পক্ষীর স্বর হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বরের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন। স্বরগুলি সাধিবার সময় ঐ সকল দেবতার রূপ ভাবিয়া সাধিতে হয়।

কোন্ প্রাণী হইতে কোন্ স্বর লওয়া হইয়াছে এবং কে কোন্ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

	প্রাণী—	স্বর—	সংজ্ঞা—	অধিষ্ঠাতৃদেবতা।
১।	ময়ূর	ষড়জ	সা	অগ্নি।
২।	বৃষ	ঋষভ	রে	ব্রহ্মা।
৩।	ছাগ	গান্ধার	গা	সরস্বতী।
৪।	সারস	মধ্যম	মা	মহাদেব।
৫।	কোকিল	পঞ্চম	পা	বিষ্ণু।
৬।	অশ্ব	ধৈবত	ধা	গণেশ।
৭।	হস্তী	নিষাদ	নি	সূর্য্য।

“ষড়্জ রৌতি ময়ূরোহি গাবোনর্দ্দন্তিচর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চোনদতিমধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলোরৌতি পঞ্চমম্।
অশ্বশ্চধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতিকুঞ্জরঃ॥”

—সঙ্গীতদর্পণম্।

“বহ্নিব্রহ্মসরস্বত্যাঃ সর্ব্বশ্রীশ গণেশ্বরাঃ।
সহস্রাংশুরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমাৎষড়্জাদিদেবতাঃ॥”

—সঙ্গীতদর্পণম্।

৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়কৃত সঙ্গীত সারের মতে “পঞ্চম” স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ‘লক্ষ্মী’।

সঙ্গীত সময় সারের মতে সপ্তস্বরের নিরুক্তি এইরূপ,—নাসা, কণ্ঠ, বক্ষ,

তালু, জিহ্বা এবং দন্ত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "ষড়্‌জ"; ঋষভের অর্থাৎ ষাঁড়ের শব্দের ন্যায় বলিয়া "ঋষভ"; নাভি হইতে উদিত হইয়া কণ্ঠ এবং শীর্ষে সমাহত হইয়া গন্ধর্ব্ব গণের সুখ উৎপাদন করে বলিয়া গান্ধার; নাভিতে সমুত্থিত হইয়া হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থলে সমাহত হয় বলিয়া মধ্যম; নাভি, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, শির এবং হৃদয় এই পঞ্চ স্থানে সমুদ্ভব হয় বলিয়া পঞ্চম; নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির এবং হৃদিস্থলে ধৃত হয় বলিয়া ধৈবৎ; এবং নাভিতে সমুত্থিত বায়ু কণ্ঠতালু শিরোহত হইয়া নিষণ্ণ (স্থিত) হয় বলিয়া নিষাদ নামে অভিহিত হয়।

রত্নাবলিতে স্বরোৎপত্তিবিষয়ে বলা হইয়াছে যে ঋগ্বেদ হইতে ষড়্‌জ এবং ঋষভ, যজুর্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার এবং পঞ্চম, আর অথর্ব্বেদ হইতে নিষাদের জন্ম।

বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত উৎপত্তি বিবরণের মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করা হইল না।

সঙ্গীত শাস্ত্রে সপ্ত স্বরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কোন জাতি; জম্বুদ্বীপাদি কোন দ্বীপে, দেব' পিতৃ, ঋষি, অসুর প্রভৃতি কোন কুলে ইহাদের জন্ম, কাহার কোন ঋষি এবং কাহার কি ছন্দ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ সকলের মূল শ্লোকও দেওয়া হইল না।

কোন রসে কোন স্বর ব্যবহার্য্য তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র রসে—সা এবং রে। ভয়ানক এবং বীভৎস রসে—ধা। করুণ রসে—গা এবং নি। হাস্য এবং আদিরসে—মা এবং পা। যথা—

সরীবীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যো গ-নী—তুকরুণে—হাস্য শৃঙ্গারয়োর্মপৌ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে ঐ সকল রসে ঐ সকল স্বরেরই বহুল ভাবে ব্যবহার হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সপ্ত স্বর ব্যতীত আরও কতগুলি সূক্ষ্ম স্বর ভারতীয় সঙ্গীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে শ্রুতি বলে। শ্রুতির ব্যবহারই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। কি কণ্ঠে কি যন্ত্রাদিতে বিশুদ্ধ ভাবে শ্রুতির ব্যবহার করিতে পারিলে সঙ্গীতে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা উৎপন্ন হয়, এবং শ্রোতার মন বিমোহিত করিয়া ফেলে। সারঙ্গ এস্রাজ বেহালার গমক এবং বীণ, সরদ, রবাব, সুরবাহার সেতারের মীড় এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বাজান হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতির লক্ষণ

এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদোঽনুরণনং বিনা।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

অনুবাদ—অনুরণন ব্যতীত ধ্বনি স্বরূপ মাত্র শ্রবণ হেতু শ্রুতি বলিয়া অভিহিত, তাহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ স্বীকৃত।

"শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বানিরেব শ্রুতিভবেৎ।"

—বিশ্বাবসু।

অনুবাদ—শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়াই ধ্বনি শ্রুতি রূপে পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্রুতির সংখ্যা মোট ২২টি। যথা—

সা[৪] রে[৩] গা[২] মা[৪] পা[৪] ধা[৩] নি[২] সা[৪] = ২২

উল্লিখিত সারণী হইতে দেখা যাইবে যে সপ্ত স্বর পরস্পর একটির পর আর একটী কতশ্রুতি অন্তর অবস্থিত। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতির নাম জাতি প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বর—		শ্রুতির নাম—	জাতি।
১। ষড়্‌জ—	সা	১। তীব্রা	দীপ্তা।
		২। কুমুদ্বতী	আয়তা।
		৩। মন্দা	মৃদু।
		৪। ছন্দোবতী	মধ্যা।
২। ঋষভ—	রে	১। দয়াবতী	করুণা।
		২। রঞ্জনী	মধ্যমা।
		৩। রতিকা	মৃদু।
৩। গান্ধার—	গা	১। রৌদ্রী	দীপ্তা।
		২। ক্রোধা	আয়তা।
৪। মধ্যম—	মা	১। বজ্রিকা	দীপ্তা।
		২। প্রসারিণী	আয়তা।
		৩। প্রীতি	মৃদু।
		৪। মার্জ্জনী	মধ্যা।

স্বর—		শ্রুতির নাম—		জাতি—
৫। পঞ্চম—	পা	১।	ক্ষিতি	মৃদু।
		২।	রক্তা	মধ্যা।
		৩।	সন্দীপনী	আয়তা।
		৪।	আলাপিনী	করুণা।
৬। ধৈবত—	ধা	১।	মদন্তী	করুণা।
		২।	রোহিনী	আয়তা।
		৩।	রম্যা	মধ্যা।
৭। নিষাদ—	নি	১।	উগ্রা	দীপ্তা।
		২।	ক্ষোভিণী	মধ্যা।

সপ্ত স্বরের ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ গতির নাম অনুলোমগতি: বা আরোহণ, আর নিম্নগতির নাম বিলোম গতি বা অবরোহণ।

সপ্তস্বরের ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের নাম "মূর্চ্ছনা"। সাতটি করিয়া তিন গ্রামে মূর্চ্ছনার সংখ্যা একুশটি যথা—

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।,,
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্তচ॥

গ্রাম, ষড়জ, গান্ধার এবং মধ্যম ভেদে তিনটি। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম মর্ত্তে আর গান্ধার গ্রাম স্বর্গে প্রচলিত। যথা—

"ষড়জ মধ্যম গান্ধারাস্ত্রয়োগ্রামামতাইহ।
ষড়্জ গ্রামো ভবেদত্র মধ্যম গ্রাম এবচ।
স্বরলোকে চ গান্ধারো গ্রাম প্রচরতি স্বয়ং॥
—সঙ্গীত চন্দ্রিকা ধৃত বচন।

উক্ত সাতটি স্বরই রাগ বিশেষ বাদি, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোন একটি রাগে যে স্বরটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় তাহাই "বাদী", যে স্বরটি বাদী স্বরাপেক্ষা কম কিন্তু অন্য স্বরাপেক্ষা বেশী লাগে তাহা "সংবাদী", যে স্বর সর্ব্বাপেক্ষা কম লাগে তাহা অনুবাদী, আর যে স্বর একেবারেই লাগে না অর্থাৎ যে স্বর ব্যবহার করিলে কোন রাগ অশুদ্ধ হয় তাহাই "বিবাদী" স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বর যেন রাজা, সম্বাদী যেন তা'র সচিব, অনুবাদী যেন ভৃত্য, আর বিবাদী যেন তাহার শত্রু।

চতুর্বিধঃ স্বরো বাদী সংবাদীচ বিবাদ্যপি।
অনুবাদীচ বাদীতু:প্রয়োগে বহুল স্বরঃ॥
—রত্নাকর।

বাদী রাজা স্বরস্তস্য সংবাদী স্যাদমাত্যবৎ।
শত্রুর্বিবাদী তস্য স্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ॥"
সঙ্গীতদর্পণম্॥

গীতের আদিতে যে স্বর স্থপিত হয় তাহাকে গ্রহস্বর এবং যে স্বরে গীত সমাপ্ত হয় তাহা ন্যাস স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বরকে অংশ স্বর ও বলা হয়। যথা—

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাস স্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীত সমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে॥
—সঙ্গীতদর্পণম্।

তিনটীমাত্র মূল বর্ণের সকৌশল মিশ্রণে যেমন নানা বর্ণের উৎপাদন করিয়া প্রকৃতিরাণী প্রভাতে সন্ধ্যায় কত ভঙ্গীরইনা রঙের খেলা দেখাইয়া আমাদের নয়ন মন মোহিত করিতেছেন, সেই রূপ ৭টি মাত্র মূল স্বরের বিচিত্র বিন্যাস কৌশলের দ্বারা কত কত বিচিত্র রাগ রাগিণী সৃষ্টি করিয়া যুগ যুগান্ত হইতে মানবকুল শ্রোতৃচিত্তে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। ভারতীয় রাগ রাগিণী সমূহের উৎপত্তি কাহিণী এইরূপ।

শিবশক্তির সমাযোগেই রাগরাগিণীর উদ্ভব হইয়াছিল। শিবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর গিরিজার বদনকমল হইতে আর একটি এই ছয়টি রাগের সৃষ্টি হয়। শিবের সদ্যোবক্ত্র হইতে শ্রীরাগের, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম এবং ঈশানাখ্যবদন হইতে মেঘরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর গিরিজা যখন লাস্যলীলায় ব্যাপৃতা ছিলেন তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জন্মিয়াছিল নাট্টনারায়ণ নামক ষষ্ঠ রাগ। যথা—

"শিবশক্তি সমাযোগাদ্ রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্তু গিরিজামুখাৎ॥
সদ্যোবক্ত্রাতু শ্রীরাগো বামদেবাদ্ বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ ভৈরবোঽভূৎ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোঽভবৎ॥

ঈশানাখ্যাগ্নেঘরাগো নট্টারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্তে নট্টনারায়ণোঽভবৎ॥"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

হরপার্ব্বতীর মুখ হইতে ছয়রাগের সৃষ্টি হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথমে ব্রহ্মা এই সকল রাগ শিক্ষা করেন। পরে তিনি প্রত্যেক রাগের পত্নীরূপে ছয়টি করিয়া ছয়ত্রীশটি রাগিণী সৃষ্টি করেন, এবং সেই সমস্ত রাগরাগিণী নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু (ইনিই তাম্বুরার সৃষ্টি কর্ত্তা), হুহু এবং ভরত এই পাঁচজন শিষ্য ও শিষ্যাকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই একখানি করিয়া সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদ ভরত প্রণীতগ্রন্থ ভূতলে, রম্ভার গ্রন্থ স্বর্গে এবং হুহু ও তুম্বুরুর সংহিতা পাতালে প্রচলিত হয়। যথা—

"ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চশিষ্যাং স্ততোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥
ততঃ সঙ্গীতকং কৃত্বা গ্রন্থং সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
আনন্দয়ন্ দেবরাজং শিষ্যাস্তে ভরতাদয়ঃ॥
রম্ভয়া রচিতা স্বর্গে ততঃ সঙ্গীত সংহিতা।
প্রচচার তয়া শক্রো নাট্যানুষ্ঠানমতনোৎ॥
প্রচার চ পাতালে হুহুতুম্বুরু সংহিতা।
দেবর্ষের্ভরতস্যাপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥"

ইতি শ্রীনারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতায়াং রাগনির্ণয়ে
তৃতীয়াধ্যায়ে।—উপক্রমণিকা সঙ্গীত সার।

একদা রম্য কৈলাসশৃঙ্গে বিল্বমূলে শিব সমীপে সুখাসীনা পার্ব্বতী ভগবানকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, রাগ রাগিণীগুলির কোনটী রাগ কোনটীই বা রাগিণী, তাহাদের রূপইবা কেমন, কোন্ ঋতুতে কোন্ সময়ে কোনটি গাওয়া যায় এ সমস্ত আমায় কৃপা করিয়া বলুন।

তখন ঈশ্বর বলিলেন,—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ এবং বৃহন্নাট (অর্থাৎ নট্টনারায়ণ) এই ছয়টি রাগ বলিয়া কথিত হয়। যথা—

"শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘ রাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

তাহার পর বলিলেন,—

মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, এবং পাহাড়িকা এই ছয়টী শ্রীরাগের বরাঙ্গণা।

দেশী, দেগিরী, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা, এবং হিন্দোলী এই ছয়টী বসন্তের বরাঙ্গনা।

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, বামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী এই ছয়টী ভৈরবের বরাঙ্গনা।

বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী এবং পঠমঞ্জরী এই ছয়টি পঞ্চমের অঙ্গনা।

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, ও হরশৃঙ্গরা এই ছয়টী মেঘমল্লারের যোষিৎ।

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নট্টহম্বীরা এই ছয়টী নট্টনারায়ণের অঙ্গনা।

এই গুলির আর মূলশ্লোক দেওয়া হইল না।

রাগিণীযুক্ত	শ্রীরাগ	শীত	ঋতুতে গাইবে।
”	বসন্ত	বসন্ত	” ”।
”	ভৈরব	গ্রীষ্ম	” ”।
”	পঞ্চম	শরৎ	” ”।
”	মেঘরাগ	বর্ষা	” ”।
”	নট্টনারায়ণ	হেমন্ত	” ”।

সর্ব্বশেষে বিধান দেওয়া হইয়াছে সে সুখপ্রদা সর্ব্ব ঋতুতেই যথেচ্ছা অর্থাৎ সকল রাগ রাগিণীই গান করিবে। যথা :—

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদা॥"

—ইতি সোমেশ্বরমতম্। সঙ্গীতদর্পণম্।

রাগরাগিণী গাইবার সময় সম্বন্ধেও শ্লোক আছে। তবে এখন যেরূপভাবে রাগ রাগিণী গাহিবার সময় প্রচলিত হইয়াছে তার সঙ্গে পূর্ব্ব নিয়মের কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীত চন্দ্রিকা নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বহু রাগ রাগিণীর ঠাটসহ গাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা এইস্থলে আর প্রদত্ত হইল না। (ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(দ্বিতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র খাম্বাজ——দাদ্‌রা।

ছায়া।

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি-সুখ-নদ'র উপকূলে।
জানি না ত, প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী।

১´ ০ ১´ ০
সা II { -া ন্‌ধ্‌া ন্‌া। সা -রা রা I -া ন্‌সা সসা। পা মা -গা I
আ য় রে০ ব স ন্ ত ০ ও০ তোর্ কি র ০

১´ ১´ ॥ ০
I -রা সন্‌া সা। রা পা মা I গা -া -া। (-া -া সা) }।
ণ্ মা০ খা। পা খা তু লে ০ ০। ০ ০ "আ"

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "নারায়ণের" প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

০ ১´ ০ ১
। -া -া র্সা I { র্সা র্সর্সা র্সর্স পা পা -া I র্সপা -ধপা মগরা।
০ ০ নি য়ে আয় তোর্ নূ ত ন্ গা০ ০০ নে০০

০ ১´ ০ ১´
। রা রগা -পমা I -গা রসন্‌া সসা। রা পপা মা I গা -া -া।
নূ ত০ ০০ ন্ পা০০ তায় নূ তন্ ফু লে ০ ০

০ ০
। (-া -া র্সা) } I -া -া সা II
০ ০ 'নি' ০ ০ "আ"

অন্তরা।

০ ১´ ০ ১´
। -া -া রা II { গা পা পা। ধধা ধা -ণা I ণা ধা -া।
০ ০ শু নি প ড়ে প্রে ম ০ ফাঁ দে ০

০ ১´ ০ ১´
। -া -া পর্সা I র্সা র্সা র্সা। পা র্সপা -ধা I পর্সা পা -া।
০ ০ তা০ রা স ব হা সে০ ০ কাঁ০ দে ০

০ ০ ১´ ০
। (-া০ -া রা) } I -া -া র্সা I { র্সা র্সা র্সা। পা পা পা I
০ ০ 'শু' ০ ০ আ মি শু ধু কু ড়া ই

১´ ০ ১´ ০
I র্সপা -ধপা মগরা। রা রগা -পমা I -গা রসন্‌া সসা। রা পা মা I
হা০ ০০ সি০০ সু খ০ ০০ ০ ন০০ দীর্ উ প কূ

১´ ০ ০
I গা -া -া। (-া -া র্সা) } I -া -া সা II
লে ০ ০ ০ ০ 'আ' ০ ০ "আ"

সঞ্চারী।

০ ১ ০ ১´
। -া -া প্‌া II { প্‌া ধ্‌া ন্‌া। ধ্‌ন্‌া -ধ্‌ন্‌া সা I সা সা -া।
০ ০ জা নি না ত প্রে ০০ ম কি সে ০

০ ১´ ০ ১´
। -া -া ন্‌া I সা রা গা । রা পা মা I গা -া -া ।
• • চা হি না সে ম ধু বি ষে • •

০ ০ ১´ ০
। (া -া প্‌া) } I -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I
• • 'জা' ৹ ৹ আ মি শু ধু বে ড়ি য়ে

১´ ০ ১ ০
I হ্মপা -ধপা মগরা । রা রগা -পমা I -গা রস্‌ন্‌া সা· । রা গা হ্মা I
বে৹ •• ড়া৹ই নে চে• •• ৹ গে য়ে প্রা ণ খু

১´ ০ ০
I পা -া -া । (-া -া হ্মা) } I -া -া পা I
লে • • ৹ ৹ 'আ' • • নি

আভোগ।

১´ ০ ১´ ০
I { পা ননা ননা । র্সা র্সা নর্সর্া I র্সা র্সা -া । -া -া র্সা I
য়ে আয় তোর কু সু ম৹৹ রা শি ৹ ৹ ৹ তা

১´ ০ ১´ ০
I র্নর্সা না ধপহ্মা । পা না ধা I নর্সা না -া । (-া -া পা) } I
রার্‌ কি র৹ণ্‌ চাঁ দে র হা• সি ৹ ৹ ৹ 'নি'

০ ১´ ০ ১´
I -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I হ্মা পা -া ।
• • ম ল য়ে র ঢে উ নি য়ে আ য়্‌

০ ১´ •• ০ ১´
। গা গা পমা I -গা রন্‌সা সসা । রা পা মা I গা -া -া ।
উ ড়ি য়ে৹ ৹ দে৹৹ এই এ লো চু লে ৹ •

০ ০
। (-া -া হ্মা) } I -া -া সা II II
• ৹ 'ম' ৹ • 'আ'

এ স্বরলিপি একতালা তালেও বেশ বাজাইতে পারা যায়। সে অবস্থায় একতালার তৃতীয় আঘাতের তৃতীয় মাত্রা হইতে ধরিতে হইবে।—লেখিকা।

নারায়ণের নিকষমণি

মানসী—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী লিখিত, অন্নদা বুক ষ্টল হইতে প্রকাশিত, আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ। ইহাতে একটি ছোট গল্প আর একটী ভ্রমণ কাহিনী আছে, গল্পটীর নামেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পের ঘটনা আধুনিক ধরণের বটে। অপ্রত্যাশিতভাবে নায়ক নায়িকার মিলন—কেহ কাহাকেও চেনেন না—তারপর অলক্ষিতে ভালবাসা—তাহার পর বিবাহের প্রস্তাব (অবশ্য দুই তিনবার না এর পর) তাহার পর আলাপ, তাহার পর বিরহ, তাহার পর হা হুতাশ, তাহার পর নৈরাশ্য—বিবাহ হইল না। ইতি সমাপ্ত। পুরীর ভ্রমণ কাহিনী সুখপাঠ্য হইয়াছে। বর্ণনাভাগে যথা—মাঝে মাঝে অসঙ্গতি আছে, ভ্রমর কৃষ্ণ চুলের গোছা চোখে মুখে লুটোপুটি খাচ্চে," তারপর পট পরিবর্ত্তন করিয়াই লেখক কহিতেছেন 'যাবার সময় দোলান বেনীটা তার পিঠে কয়েকটা আছাড় খেল মাত্র' কবি ভ্রাতারা বলিতে পারেন কিরূপে উহা সম্ভব হয়? আর এক স্থানে লেখক বলিতেছেন '৫ টায় ত ট্রেণ ছাড়বে ইত্যাদি' তারপর 'তখন বেলা ৪টা…গার্ড হুইসেল দিলেন…লাফ দিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়া বসিলাম।" ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। ভাল ছাপা কাগজ ও মলাট সুন্দর।

স্বরাজ সাধন—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভারত জুড়ে যে প্রচণ্ড আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্চে, তার একটা পরিচয় দেবার জন্য এই পুস্তিকাখানি লেখা হয়েছে। এর—বিষয় নির্ব্বাচন দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে—নবযুগের আহ্বান, অসহযোগিতা জাতির প্রাণের কথা, অসহযোগিতার অর্থ ও কারণ, পাঞ্জাবের কথা, খিলাফতের কথা, অন্নকষ্ট ও বস্ত্রের অভাব, মহাত্মা গান্ধী, অস্ত্রধারণ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও স্বাধীনতা-লাভের অন্তরায়, মহাত্মার বাণী, অসহযোগিতা আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতার পথ, এবং আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতা—এই কয়টি বিষয় এই পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আমাদের মনে হয় এখানি পড়লে মোটামুটি বর্ত্তমান আন্দোলনের

ধারাটিকে বুঝতে সহজ হবে। সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত হয়ে বইখানি আরও সুখপাঠ্য হয়েছে। আমরা এ পুস্তক খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

যাত্রী

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

অসীম পথে চলেছি যবে
ফির্‌ব না আর ফির্‌ব না,
অকূল মাঝে ভেসেছি যবে
ভিড়্‌ব না আর ভিড়্‌ব না।

পথের মাঝে থাক্‌না কাঁটা,
সাগর জলে ঢেউয়ের ঝাঁটা
দুঃখ আসুক ঘিরে আমায়
টল্‌ব না কো টল্‌ব না।

শিকল যত পড়্‌বে পায়ে
আসবে বাধা যত,
মুক্তি তরে চিত্ত আমার
উঠবে নেচে তত।

বিঘ্ন বাধা আস্‌বে যত,
নীরব হ'য়ে সইব তত,
শত বাধায় লক্ষ্য অমার
ভুল্‌ব না কো ভুল্‌ব না।

পিতলকে সোণা বলিয়া চালাইলে সোণার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটার ও জাত যায়। অথচ, সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। যায়গা ও সময় বিশেষে হ্যাট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটু-খানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্যগোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে; আজ এ দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার যো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন-অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে সুরু করিয়া কনেষ্ট-বল পর্য্যন্ত সবাই বলিতেছেন সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও—নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এম্‌নি। অর্থাৎ অত্যাচার অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজা-পুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এম্‌নিটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুই জন পাকা ও অত্যন্ত হুঁসিয়ার এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম, একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে সিডিশন হয়না—ওটা বিগড়াইলেই হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন, একটা মজা আছে। লেখার গোড়ায় 'যদি' এবং শেষে "কি না?" দিতে হয়, এই দুটা কথা নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবে ও বা, বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শও যেমন দুর্ব্বোধ, অপরের উপদেশও তেম্‌নি অন্ধকার ঠেকিল। লিখিয়া লিখিয়া নিজেও বুড়া হইলাম, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক মতই কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কি না স্থির

করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি', ও 'কিনা', বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সত্যবাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে ছাপা ওয়ালা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটী নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজ রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁদে ফাঁদে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে সুরু করে তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে তাহার মহত্ত্ব বাড়ে না এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূচ বিঁধিতে থাকে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আরও একটু পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৮।

আলোর উদ্দেশে

[দরবেশ]

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
ঘুচাও তোমার বর্ণেগন্ধে অন্ধকারের কালো
এই ভারতের দেশে দেশে,
মরণ-বরণ ঘুমের শেষে,
কণক কিরণ দেখাও হেসে,—
জীবন-জাগন ঢালো।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিটোল ছন্দে
বাজাও তোমার বাঁশী;
ঘুমভাঙাদল নয়ন মেলে
খেলুক হাসি হাসি।
রঙীণ ডানার পরশ পেয়ে,
তরুণ প্রবীণ চলুক ধেয়ে;
পথের বিপুল আঁধার ছেয়ে
হোমের আগুন জ্বালো।